রুবিমাসির জম্বুদেশীয় শ্বশুরের দেশ থেকে প্রায়—পনেরো হাত যে দু'খানা সিল্কের শাড়ি উপঢৌকন এলো, তার থেকেই সব সমস্যার শুরু। এতো লম্বা শাড়ি পরবেন কী ক'রে। চার হাত ক'রে ফ্যালনা অংশটুকু তাই কেটে বাদ দেওয়া গেলো। তাই ব'লে তো ফ্যালনা আটহাত সিল্ক তো আর সত্যিই ফ্যালনা নয় ; এ দিয়ে একটা কিছু তৈরি হোক। হিসেব নিয়ে দেখা গেলো নানা জনের নানা দরকার : অন্ততপক্ষে মামার দু'খানা জামা, ইতুর ব্লাউজ, মিনতির ফ্রক, ভাগনের হাফপ্যান্ট, এবং চাকর দাতারামের একঠো কুর্তা। আট হাতে এতো সব হবে কী ক'রে। না, কেরামত দর্জির কেরামতিতে তাও হলো, এবং আরো আশ্চর্য, সবার গায়েও লাগলো ; কেরামত নামটা তার বাবার কৃতিত্ব হলেও কেরামতিটা তার নিজস্ব।

শিবরামের কেরামত পারে একগজে একটা লেপের ওয়াড় তৈরি ক'রে দিতে, আর শিবরাম পারেন এক ফোঁটা একটি ছোটো গল্পে একটা অতুল কৌতুকের পৃথিবী গ'ড়ে তুলতে। 'কেরামতের কেরামতি' শিবরামীয় প্রতিভার অনন্য উদাহরণ।

শিবরাম চক্রবর্তী
প্রণীত

কেরামতের কেরামতি

প্রকাশক
নিউ স্ক্রিপ্ট

১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, কলকাতা-২৯

এ, ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

সূচি-পত্র

উৎসর্গ-পত্র

অমিতানন্দ দাস
স্নেহভাজনেষু

কে রা ম তে র কে রা ম তি

রুবি মাসীর শ্বশুর থেকেই সুরু হল ব্যাপারটা। আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে তিনি নিজের পুত্রবধুকে এক জোড়া রেশমী শাড়ি দিয়ে গেলেন।

দিয়ে ত গেলেন! কিন্তু সেই শাড়ির সঙ্গে এল ভারী এক সমস্যা! শাড়ির বহর তিন হাত আর লম্বাতেও শাড়িটা তেমনি মাপসই। শাড়ি হাতে খাড়া হয়ে দাঁড়ালে ওটা রুবি মাসীর গলা অব্দি পৌঁছয়।

এ ত গেল শাড়ির এক বহর। খোলবার পর ওটার আরেক বহর দেখা দিল—লম্বায় প্রায় পনেরো হাত!

গালে হাত দিয়ে বলল রুবি মাসী—এ শাড়ি গলায় বেঁধে ঝুলব নাকি গো!

আমি বললাম—কেন রুবি মাসি! শাড়িটাত বেশ ভালই। খাস কাশ্মীরের খাসা চীজ। রেশমটা দেখেছ কেমন। সূর্যের আলোর মতন ঝকঝক করছে!

কিন্তু অমন চকচকে চমৎকার শাড়িটা পেয়েও মুখ ভার হোলো মাসীর।—এই পনের হাত শাড়ি আমি পরব কি করে! আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে কি করে যে পরে তাও জানিনে!

রুবি মাসীর বিয়েটা হচ্ছে আন্তঃপ্রাদেশিক। কাশ্মীরের দিকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি—জম্বুর এক সর্দার পুত্রের সঙ্গে। সেখানকার মেয়েরা অমনি লম্বা লম্বা শাড়ি পরে নাকি—গুছি দিয়ে দিয়ে ঘাগরার মতন করে ঘুরিয়ে! তাই তাদের অত বড় শাড়ি লাগে। বাঙালীর মেয়েরা

ত তেমনধারা কাপড় পরে না।

'শ্বশুরবাড়ি গেলেই জানতে পাবে'—

আমি বললাম—'কি করে পরতে হয় তোমার জাম্বুবান বরই তোমায় শিখিয়ে দেবে।'

সম্পর্কে মাসী হলেও রুবি মাসী আমার সমবয়সী। তাই তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে আমার বাধে না।

বরকে জাম্বুবান বলায় রুবি মাসী মুখ ব্যাঁকালেন—বললেন—যেমন হনুমানের মতন কথা!

তার পরেই তিনি ডুকরে উঠলেন হঠাৎ—কেটে ফ্যাল্ কেটে ফ্যাল্! শুনে ত আমি চম্‌কে গেলাম। সেকি! কাকে কাটতে চাইছে—হনুমানকে না জাম্বুবানকে!

'এ দৃশ্য আমার সহ্য হচ্ছে না। শাড়ি-তুটোর চার হাত করে কেটে ফ্যাল!' বললেন তিনি তারপর। তখন সব পরিষ্কার হল।

বলতেই আমি চার হাতে তৈরি। কাঁচি নিয়ে কচ কচ করে তক্ষুণি শাড়ি তুখানার আট হাত কেটে বাদ দিয়েছি।

'এই ফ্যালনা জিনিসটা নিয়ে তুমি কি করবে রুবি মাসী।' বললাম আমি তখন—'আমায় দিয়ে ফ্যালো। কেমন?'

'তুই নিয়ে কি করবি?'

'জামা বানাবো। ডবল বহর আছে, চার গজে তোফা তুখানা শার্ট হবে।'

'কিন্তু ওর গায়ের মাপ তো আমার জানা নেই।'

'কার কথা বলছ?'

'তোর মেসোমশায়ের।'

'বারে! আমি তোমার জাম্বুবানের মেরজাইয়ের জন্য চাইছি নাকি? আমি ত হনুমানের হাফশার্টের কথাই বলছি।'

'বারে!' ইতু এলো এগিয়ে—'তুমি বাড়ির জামাই না কি যে, খালি তোমার জামাই হবে? আমরা কি রুবি মাসীর কেউ না? বানের জলে ভেসে এসেছি আমরা? ওর থেকে আমারো একটা ব্লাউজ হওয়া চাই।'

'হোক।' অম্লানবদনে তথাস্তু করে দিলেন রুবিমাসী।

আমার ভাইঝি মিনতি দাঁড়িয়েছিল সামনে। 'আমার একটা ফ্রক কিন্তু চাই কাকু। সিল্‌কের ফ্রক পরবো আমি।' সে মিনতি করে সাধলে।

আমি বললুম—'হবে। আমার যদি একটা জামা করি তাহলে একটা জামা হয়েও হাত তিনেক কাপড় বাঁচবে ত। তাইতে ইতুর ব্লাউজ আর তোমার ফ্রক—দুই হয়ে যাবে মনে হয়।'

'আর আমার একটা হাফ প্যাণ্ট? সেটা হবেনা?' আমার ভাগনে অশোক এবার যোগ দিল সেই সাথে—'সিল্কের হাফ্‌প্যাণ্ট আমি মামা পরিনি কখনো।'

'কেউ পরেছে কখনো?' আমি এবার ভারী ব্যাজার হই: 'সিল্কের হাফপ্যাণ্ট আবার হয় নাকি রে?'

'তা বললে আমি শুনছি না। ভাগনে যখন—আমার ভাগ আমি নেবই।' অশোক একেবারে নাছোড়বান্দা।

'আচ্ছা, যদি হয় তো হবে।'

'হয় তো ফয়তো নয়, হতেই হবে। তুমি কেরামতুল্লার কাছে চলে যাও, সে সব পারে। কখনো খদ্দের ফেরায় না। এক গজ কাপড়ে একখানা লেপের ওয়াড় বানিয়ে দেয়।'

'বলিস কি রে! এম্‌নি তার কেরামতি?'

'হ্যাঁ, দেখলে তুমি অবাক হবে। তার কাছে চলে যাও ঐ কাপড় নিয়ে। আমাদের পাড়ার দর্জি তো। সবাই তাকে দিয়ে বানায়।'

চললাম কেরামতুল্লার কাছে কাপড় হাতে। এক হাতে রেশমের টুকরোটা আরেক হাতে ইতুর একখানা ময়লা ব্লাউজ, মিনতির একটা ছেঁড়া ফ্রক্, অশোকের বাতিল হাফপ্যাণ্ট নিয়ে।

যাবার মুখে বাসার চাকর দাতারাম হাঁক ছাড়ল—'বাবুজি! হামকো ভি একঠো কুর্তা বানায়কে দিজিয়ে!'

সিল্কের টুকরো হাতে করে ধোপার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কেরামতুল্লার খোঁজে বেরুলাম।

কেরামতুল্লা দর্জি টুকরোটা হাতে নিয়ে বলল—কী হবে?

'আমার একটা হাফশার্ট যদি ফুলশার্ট নিতান্তই না হয়।' 'এই একটা টুকরোতেই হয়ে যাবে।' বলে সে আমার মাপ নিল।

কেরামতি আছে কেরামতুল্লার—অশোক যা বলেছিল তা মিছে নয়।

'গায়ে লাগবে ত বেশ?' তবু তাকে শুধালাম একবার।

'হ্যাঁ, লাগবে বই কি। বেশ ফিট করবে।' সে জানাল।

'আর এই টুকরোটায় আমার বোনের *জন্য* একটা ব্লাউজ। এই তার মাপ।' বলে ময়লা ব্লাউজটা ফেলে দিলাম তার সেলাই কলের ওপর।

'হবে।' বলল কেরামত আলি—'তাও হবে।'

'আর আমার ভাইঝির জন্যে একটা ফ্রক।'

'হতে পারে।'

'গায়ে লাগবে ত?'

'লাগবে বই কি।'

'আর আমার ভাগনের জন্য একটা হাফপ্যাণ্ট।'

'হাফপ্যাণ্ট? তাও চাই?'

'হ্যাঁ—নইলে সে আবার বিচ্ছিরি কাণ্ড করবে।'

'আচ্ছা, দেখব।'

'দেখবে ত, কিন্তু দেখলেই হবে না। দেখতে হবে যেন গায়ে হয়।'

'গায়ে লাগিয়ে দেব নিশ্চয়। তা না হলে চলবে কেন?'

'আর আমাদের চাকরের জন্য একটা কূর্তা···কূর্তা না হয়ত নিদেন ফতুয়ার মত একখানা করে দেবে?' আমি সপ্রশ্ন নেত্রে তাকালাম।

'দেব বানিয়ে।'

'গায়ে লাগবে ত?'

'আলবৎ লাগবে। আপনি মজুরির টাকা দশটা আগাম দিয়ে যান তো। বহুৎ মেহনৎ আছে মশাই।'

টাকাটা দিয়ে বললাম—কবে নিতে আসব?

'সামনের বুধবার।'

আসার আগে মনে করিয়ে দিলাম আবার—'এই চার গজ কাপড়ে শার্ট, ব্লাউজ, ফ্রক, হাফপ্যাণ্ট, কূর্তা হবে ত?'

'হতেই হবে।'

'গায়ে লাগবে ত সবার?'

'লাগিয়ে দেব। কিছু ভাববেন না।'

'গায়ে লাগলেই হল। গায়ে লাগা নিয়ে কথা। তার পর যদি একটু স্টাইলের হয় ত কথাই নেই।' বলে আমি চলে এলাম।

বুধবার পড়তে তর সইছিল না কারো।—ভোর হতেই দর্জির দোকানে হাজির হলাম আমরা—আমি-ইতু-অশোক-মিনতি-দাতারাম—শোভাযাত্রা করে সবাই।

'একে একে আসুন বাবু সব।' বলল দর্জি।

আমি ঢুকতেই দর্জি বলল—'বাঃ, এইত বেশ গায়ে লেগেছে। আপনি মোটা মানুষ, আপনার গায়ে না লেগে যায়!' ইতুর প্রবেশ

হতেই শুনলাম—'বাঃ, দিদিমণিরও গায়ে লেগে গেছে।' 'হ্যাঁ খুকীরও ত গায়ে লাগল।' মিনতির বেলায় বলল দর্জি। আর অশোক ঢুকতেই শোনা গেল—'বাঃ, খোকাবাবুরও বেশ লাগসই হয়েছে।'

তরেপর দাতারাম ঢুকল—ঢুকতে পারল না ঠিক। দোকানের ভেতরে আর জায়গা ছিল না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'এর তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত লেগে গেছে দেখছি।' বলল দর্জি।

'তোমার কথার তো কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না দর্জি। আমাদের জামা কোথায়?'

'ঐ তো দরজার গায়ে লাগানো। আপনার চাকরের গায়ে এখন লেগে রয়েছে—' সে দেখাল।

দেখলাম। দরজার সঙ্গে লট্‌কানো একটা কিম্ভূতকিমাকার চীজ—তার বুক অবধি হাফশার্টের মতন, তারপরেই ব্লাউজ—ব্লাউজের কিয়দংশ। তার কয়েক ইঞ্চি নিচেই ফ্রকটার শুরু—ফ্রক না বলে ফ্রকের অপভ্রংশ বলাই উচিত। একটা ধার ফ্রকের মতন, আরেক ধারে হাফপ্যান্টের অর্ধেক। তলার দিকের খানিকটা যে কী তা আমার বোধগম্য হল না, বোধহয় তা দাতারামের কূর্তাই হবে। বা, কূর্তার একটা অপচেষ্টা। সব কিছু জড়িয়ে আগাগোড়া জোড়া তালি মেরে একাধারে আমাদের বিচিত্র ফরমাসের তালিকা।

'এর মানে?' আমি জবাবদিহি চাইলাম—'মানে কী এর?'

'মানে, যা যা আপনি চেয়ে ছিলেন। বানাতে যে কী মেহনৎ হয়েছে হুজুর তা আপনাকে আমি কী বলব। যা মাথা খাটাতে হয়েছে আমায়,—আমার মাথা ধরে আছে আজ কদিন থেকে।'

'কিন্তু এ জামা কি পরা যায়?' আমি জানতে চাইলাম। 'কেউ

পরতে পারে ?'

'পরবার ত কথা নয় বাবু, গায়ে লাগবার কথা। আপনি চেয়েছিলেন যেন গায়ে লাগে সবার। তা তো আমি লাগিয়ে দিয়েছি। আপনাদের সকলেরই গায়ে লেগেছে। যেমন যেমন আপনারা এলেন, আমি ভালো করে নজর করলাম। আপনাদের সবারই গায়ে লেগেছে। এখন, এই জামাটা নিয়ে কি করবেন আমি বলি। এটাকে নিয়ে আপনাদের অন্দর মহলের খাস দরজায় টাঙিয়ে দিন। তাহলে এই জামাই বাড়ির কর্তা গিন্নির থেকে ছেলেমেয়ে দোস্তবেরাদর সবার, এমন কি, বাড়ির ঝি চাকরের পর্যন্ত গায়ে লেগে যাবে। যেতেও লাগবে আসতেও লাগবে। এমন লাগসই চীজ আর হয় না বাবু!'

বাসে উঠেই হর্ষবর্ধন ভাবিত হন। ভাইকে ডেকে বলেন —"সনাতনখুড়ো বলেছিল সাহেবি দোকানে পাওয়া যায় জিনিসটা। কিন্তু সাহেবি দোকান কোথায় কে জানে!"

"খুড়োর আর কী, বলেই খালাস!" গোবর্ধন গজরায়— "এখন আমরা ঘুরে মরি সারা কলকাতা!"

হর্ষবর্ধন মুখভঙ্গী করেন—"কাকেই বা জিজ্ঞেস করি—কেই বা জানে!"

ওরা ছাড়া আরো একটি আরোহী ছিল বাসে, তিনি মহিলা। গোবর্ধন সেইদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—"ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না? মেয়েদের অজানা কী আছে?"

প্রস্তাবটা হৃদয়গ্রাহী হয় হর্ষবর্ধনের। "তুই জিজ্ঞাসা কর!"

"তুমিই কর দাদা!" গোবর্ধনের সাহসের অভাব।

"কী ভীতু রে!" তিনি ফিসফিস করেন—"কর না তুই, গোবরা! ভয় কী?"

"উঁহু!" গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে।

অগত্যা হর্ষবর্ধনকেই মরিয়া হতে হয়। অনেকবার হাত কচলে অবশেষে তিনি বলেই ফেলেন—"দেখুন, আমরা একটা মুস্কিলে পড়েছি"—সমস্যাটা তিনি প্রকাশ করেন মহিলাটির কাছে।

মহিলাটি জবাব দেন—"আপনারা হল অ্যাণ্ডারসনের দোকানে যান না কেন? আর কিছুদূর গেলেই তো—"

এই বলে তিনি বাসের কণ্ডাকটারকে ওঁদের যথাস্থানে নামিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে নেমে যান এলগিন রোডের মোড়ে।

বাসওয়ালা চৌরঙ্গীতে এক সাহেবি দোকানের সামনে ওদের নামিয়ে দেয়—"হলন্দর-সনকো দুকান এহি হ্যায় বাবুজি।"

তারপর হর্ন বাজিয়ে চলে যায় বাস।

বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—"হ্যাঁ, এই দোকানই বটে। কী বলিস গোবরা?"

"ঠিক। সনাতনখুড়ো যেমন বলেছিল মিলছে তার সঙ্গে হুবহুব।" গোবর্ধনও ঘাড় নাড়তে কার্পণ্য করে না।

"পড়্ তো! পড়ে গ্যাখ্ তো, কী লিখেছে বড়-বড় ইংরিজিতে!"

গোবর্ধন বানান করে করে পড়ে মনে মনে। তারপর বলে—"বুঝেছ দাদা, এরা সব হল্যাণ্ডের। হল্যাণ্ড বলে একটা দেশ আছে জান না? ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইসকট্‌ল্যাণ্ড—"

"যা যাঃ! তোকে আর ভূগোল ফলাতে হবে না। ভারি তো বিদ্যে! তায় আবার ইসকট্‌ল্যাণ্ড!" হর্ষবর্ধন ধমকে গ্যান—"কী পড়লি তাই বল।"

"ঐ কথাই। হল্যাণ্ড আর তার ছেলেপুলে।" গোবর্ধন ব্যাখ্যা করতে চায়। "ঐ তো পষ্টই লিখে দিয়েছে। পড়েই গ্যাখ না। হল্যাণ্ড—অ্যাণ্ড—অ্যাণ্ড মানে তো এবং? অ্যাণ্ড হার - হার মানে তো তার? হিজ—হার মনে নেই? অ্যাণ্ড হার সন—এবং তার ছেলেপুলে।"

হর্ষবর্ধনের চোখ এবার স্বভাবতই কপালে ওঠে। অ্যাঁ? এত বড় কথা লিখে দিয়েছে! কলকাতায় এসে কারবার করছে কিনা স্বয়ং হল্যাণ্ড? সঙ্গে আবার ছেলেপুলে নিয়ে? অবাক কাণ্ড!

হর্ষবর্ধনের চোখ ঘামাতে হয়, বাধ্য হয়েই। চোখ খাটাতে নিজেকে রাজি করা ওঁর পক্ষে সহজ নয়, কেননা একটু খাটালেই তাঁর চোখ টাটায়—চল্লিশের পর থেকেই এমনি। যাই হোক, বদন ব্যাদান করে আকর্ণ চক্ষুবিস্তার করার চেষ্টা পান তিনি।

নাঃ, অতটা ভয়াবহ কিছু নয়। ক্রমশ তাঁর হাঁ বুজে আসে⋯চোখও সংক্ষিপ্ত হয়।

"হার কই? হার?" উষ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি—"এইচ্ গেল কোথায়? হার সনের এইচ্—শুনি?" গোবরাকে তাঁর প্রহার করার ইচ্ছে হয়।

"পড়ে গেছে।" গোবর্ধন আমতা আমতা করে—"পড়ে যায়না কি?"

"তোর মাথা! পড়ে গেলেই হল? তক্ষুনি তুলে ধরে আবার লাগিয়ে দিত না তাহলে?" হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন—"ও-কথাই নয়! কথাটা হচ্ছে—হুম!"

দাদার আবিষ্কার অবগত হবার জন্যে উদগ্রীব হয় গোবর্ধন।

"কথাই হচ্ছে, আর কিছু না - হলধর আর ইন্দ্রসেন।" বলে গোঁফের ডগায় তিনি ডবল হস্তক্ষেপ করেন এবার।

গোবর্ধন অবাক হয়ে যায়—"অত বড় লম্বাচৌড়া কথাটা হয়ে গেল হলধর আর ইন্দ্রসেন!"

"হবে না কেন?" হর্ষবর্ধন বলেন, "ইংরিজিতে বানান করতে গেলে তাই তো হবে। কলকাতা কেন ক্যালকাটা হয় তবে? ব্রহ্মদেশ কেন বার্‌মা হয় শুনি? গঙ্গা গ্যাঞ্জেস? ইংরিজিতে আমার নাম বানান করে ছ্যাখ্ না, তাহলেই টের পাবি। করে ছ্যাখ্!"

সে দুশ্চেষ্টা গোবর্ধন করে না—দুঃসাধ্য কাজে স্বভাবতই সে

পরাঙ্মুখ, এবং পরমুখাপেক্ষী।

অগত্যা হর্ষবর্ধনই প্রয়াস পান—"আমার নামের বানান বড় সোজা নয় রে! অনেক মাথা ঘামিয়ে তবে বের করেছি। প্রথমে ধর, এইচ—ও—আর—এস—ই,—কী হল? হর্স। তারপরে হবে বি—আই—আর—ডি,—কা হল? বার্ড। তারপর ও—ন,—অন। হর্স-বার্ড-অন! হুম্।"

গোবর্ধনের বিস্ময় ধরে না। ওর দাদার প্রতিভা আছে, বাস্তবিক!

"মানেও কত বদলে গেল! নিজের অর্থ নিজেকেই তাঁর খোলসা করতে হয়। "কোথায় আমি হর্ষবর্ধন, না কোথায় আমি ঘোড়ার ওপরে পাখি! কিংবা পাখির ওপরে ঘোড়া? ও একই কথা!"

মানেটা মনঃপূত হয় না গোবরার। ঘোড়ার সঙ্গে তার দাদার তুলনা—ছ্যাঃ! দাদাকে ইতর প্রাণীর আসন দান করতে কুণ্ঠা হয় তার।

সে বিরক্তি প্রকাশ করে—"কিন্তু যাই বল দাদা! ইংরিজি করলে নামের আর কোন পদার্থ থাকে না! হর্ষ কথাটার বাংলা মানে হল আনন্দ, আর ইংরিজি মানে কিনা ঘোড়া! ঘোড়ায় আর আনন্দে কত তফাত! ভাব তো একবার!"

গোবর্ধন একটা হাত আকাশে, আর একটা হাত পাতালে পাঠিয়ে যেন ব্যবধানটাকে পরিস্ফুট করতে চায়।

"কিছু তফাত নেই! ঘোড়ার পিঠে চেপেছিস কখনো? চাপলেই বুঝবি।" হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি হয়—"ঘোড়া আর আনন্দ এক।"

"হ্যাঁ, যদি পড়ে না যাও তবেই!" গোবর্ধন গোঁ ছাড়ে না।

"তোর যেমন কথা! আমি বুঝি পড়ে যাই কখনো? দেখেছে কেউ? তা আর বলতে হয় না!" ঘোড়ার সঙ্গে নিরানন্দের কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে কখনো হয়েছিল কি না হর্ষবর্ধন সে কথা ভুলে থাকতেই চান। "কিন্তু আমার ছবিটা কেমন হয় বল্ দেখি? একটা ঘোড়া, তার পিঠের ওপর একটা পাখি। কিংবা একটা পাখি, তার পিঠে একটা ঘোড়া—সে যাই হোক। কেমন, খাসা হয় না? চমৎকার!"

নিজের ছবির কল্পনায় নিজেই তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন তবু গোমড়া হয়ে থাকে—"এর চেয়ে তোমার সেই ছবিই ছিল ভাল।"

"কোন্ ছবি?"

"সেই যে সেদিন একটা লোক মইয়ে উঠে আমাদের বাড়ির দেয়ালে সাঁটছিল—?"

"সেই কোন্ রাজা মহারাজার ছবি!" ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্মৃতির পঙ্কোদ্ধার করেন হর্ষবর্ধন—"না রে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কিংকং না কী!" গোবর্ধন সায় দ্যায়।

"এবার মনে পড়েছে।" হর্ষবর্ধন বলেন—"ওঃ! আমার সেই আরেক প্রতিমূর্তি—যা দেয়াল থেকে খুলে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে তোর বৌদিকে উপহার দেব বলেছিলাম? সে-ছবি তো ভালই—" হর্ষবর্ধন বাক্যটাকে সজোরে শেষ করেন—"কিন্তু আমার এ-ছবিই বা এমন মন্দ কী!"

"কী জানি!" গোবরা ঘাড় নাড়ে—"তোমার চারপেয়ে ছবি বৌদির পছন্দ হলে হয়!"

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন—"হ্যাঁঃ, তাই নিয়েই আমি মাথা ঘামাচ্ছি কিনা! তোর বৌদির মনের মত হবার জন্যে হাত-

পা সব একে-একে ছেঁটে ফেলতে হবে আর কি !”

ঘোড়ার কথা ছেড়ে গোড়ার কথায় ফিরে আসে গোবর্ধন। “তা ইন্দ্রসেন না-হয় হল। কিন্তু ‘ধর’ কই? ‘ধর’? হলধরের ‘ধর’?”

“চল চল, আর বকতে হবে না তোকে। কেন, ‘হল’ তো ঐ রয়েছে! মাথা থাকলেই হল, ‘ধর’ নিয়ে কী হবে?”

হর্ষবর্ধনের পদক্ষেপ শুরু হয়। গোবর্ধন আর বাক্যব্যয় করে না।

দোকানের ভেতরে ঢুকতেই এক বাঙালী কর্মচারী এগিয়ে আসে—“কী চাই আপনার?”

“আমার কিছু চাই না।” হর্ষবর্ধন বলেন—“আমাদের দেশের সনাতনখুড়ো—তারই একটা চাই জিনিস, তার জন্যেই কিনতে আসা।”

“কী জিনিস বলুন।”

“আপনাদের এই হলধরের দোকান থেকে অনেকদিন আগে একটা মাখন-তোলার কল তিনি কিনে নিয়ে গেছলেন। আমাদের সনাতনখুড়ো। সেই কলের, মশাই, একটা খুরি গেছে হারিয়ে। সেই কলেই লাগানো থাকত সেই খুরি—সেই খুরিটা চাই।”

“মাখন-কলের খুরি? কী রকম বুঝিয়ে দিন তো?”

“আমি কি আর দেখতে গেছি? হারিয়েই গেল, তার আর দেখলাম কখন!”

গোবর্ধন যোগ ছায়—“কী রকম আর? এই, খুরি যেমন হয়।” বাকবিতণ্ডা দেখে এক সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান এসে দাঁড়ায়—“হোয়াট বাবু?”

বহুদিন থেকেই হর্ষবর্ধনের এই বাসনা ছিল নিজের ইংরিজি

বিদ্যার বহর কোথাও জাহির করেন—এখন অযাচিত ভাবেই সেই আকস্মিক যোগ যেন আবির্ভূত হয় তাঁর জীবনে।

তিনি আর কালবিলম্ব করেন না—"ইয়েস সার। ইয়েস—উই ওয়াণ্ট—উই ওয়াণ্ট এ খুরি—"

"খুরি—হোয়াট ?"

"ইয়েস, খুরি। খুরি, সার !"

"খুরি ? দি স্পেলিং ?" সাহেব প্রশ্ন করে।

"হোয়াট সার ?" হর্ষবর্ধনের বোধগম্যতার বাইরে পড়ে প্রশ্নটা।

"বানান করতে বলছে।" বাঙালী বাবুটি বুঝিয়ে দেয়।

"ও ! বানান ? খুরি—খ-য়ে হ্রস্ব-উ—"

"উঁহুহু ! গোবর্ধন বাধা দেয়—"ইংরিজি বানান। বাংলা কি বুঝবে সাহেব ?"

"ও ! ইংরিজি ? খুরি—কে-এইচ-ইউ-আর আই—।"

" 'আই'—তুমি ঠিক জান ? 'ওয়াই'-ও তো হতে পারে ?" গোবর্ধন ফিসফিসায় কানের কাছে।

"পাগল ! 'ওয়াই' হয় কখনো ? বি-এল-এ ব্লে, বি-এল-ই ব্লি, বি-এল-আই ব্লাই। তারপর বি-এল ও ব্লো, বি-এল-ইউ ব্লিউ, আর—বি-এল-ওয়াই ব্লোয়াই।"

"তাহলে খুরি করতে তুমি খুরাই করছ যে।"

"তাই নাকি ? তাই তো !" হর্ষবর্ধন আকাশ থেকে পড়েন ! "নো সার নট 'আই'—" তিনি তৎক্ষণাৎ 'ভ্রম-সংশোধন' যোগ করেন—"বাট 'ই'—ওনলি 'ই' সার।"

বানানটা মনে মনে আন্দোলন করে সাহেব বাঙালী কর্মচারীটিকে উদ্দেশ করে বলে—"ব্রিং দি চেম্বার্স, বাবু !"

চেম্বার্স আনীত হলে সাহেব পটাপট পাতা উলটে যায়।

ক্রমশ সাহেবের কপালে রেখা পড়ে, ভুরু কুঁচকোয়, নাক সিঁটকোয়—সারা মুখ বিকৃত হয় অবশেষে; খুরির কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না।

গোবর্ধন মন্তব্য করে—"বাব্বাঃ! কী মোটা বই একটা! বোধহয় ইংরিজি মহাভারত!"

"মহাভারত নয়, অভিধান।" কেরানীবাবুটি বলে।

"ড্যাম ইওর খুরি!" সাহেব ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—"ব্রিং অক্স-ফোর্ড!"

ইতিমধ্যে এক মেম-সেল্‌স্‌ম্যান এসে কি এক জরুরি কথা বলে, সাহেব তার সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের অন্য ধারে চলে যায়। বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে যায়—"চেম্বারমে লে যাও।"

"বাবা, কী আওয়াজ!" গোবর্ধনের পিলে চমকায়।

"হবে না কেন? গোরু খায় যে। গোরুর আওয়াজটা কি কম?—হাম্—"

গো-ডাকের গোড়াতেই দাদার মুখ চেপে ধরে গোবর্ধন। "করছ কী! ধরে নিয়ে যাবে যে!"

"হুঁঃ! নিয়ে গেলেই হল!" হর্ষবর্ধন বুক ফোলান—"মাইরি আর কী!"

"ভুল করে গোরু মনে করে ধরতে পারে তো? তখন খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ?"

বেয়ারা এসে ওদের ডাকে—"চলিয়ে, চেম্বারমে চলিয়ে।"

সাদর অভ্যর্থনায় হর্ষবর্ধন আপ্যায়িত হয়ে এগিয়ে চলেন।

যেতে যেতে গোবর্ধন কিন্তু কানাঘুসো করে—আশঙ্কা অব্যক্ত রাখা অসম্ভব হয় ওর পক্ষে—"আমাদের অভিধানের মধ্যে নিয়ে ঢুকিয়ে দেবে নাকি দাদা?"

"হ্যাঃ! ঢোকালেই হল!" হর্ষবর্ধন ভড়কাবার ছেলে নন—"কেমন করে ঢোকায় দেখাই যাক না একবার! এত বড় মানুষটাকে চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে—অত সোজা না! আমরা কি জলছবি—যে লাগিয়ে দিতেই অভিধানের গায়ে সেঁটে যাব অমনি?"

ভাইকে অভয় দেবার জন্যে, গটমট করে চলতে চলতেই তাঁকে বুকের ছাতি ফোলাতে হয় অতি কষ্টে।

ওঁদের দুজনকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে ছায় বেয়ারা—"আভি বড়া সাহাব চেম্বারমে বাত করতেঁ হেঁ। আপলোগ হিঁয়া বৈঠিয়ে। কল হোনে সে হাম তুরন্ত লে যায়েঙ্গে।"

"কলের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলবে না তো দাদা?" গোবর্ধন আবার ঘাবড়ায়।

"হ্যাঃ! পিষলেই হল!" অনুচ্চ কণ্ঠে যতটা সম্ভব পরাক্রম প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কলের কথায় উনিও যে বেশ বিকল হয়ে এসেছেন, ওঁর ভাবান্তর থেকে সেটা বুঝতে দেরি হয় না।

"হ্যাঃ, পিষলেই হল! আমরা ঢুকতে যাব কেন কলে? আমরা কি ইঁদুর? ইঁদুররাই কেবল বোকার মত ঢোকে কলের মধ্যে।"

মুখে সাপট দেন বটে, কিন্তু বেয়ারার ভাবভঙ্গী ক্রমশই যেন ওঁর কেমন-কেমন ঠেকে। গোবর্ধনের কাপৌরুষ ওঁর মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। সনাতনখুড়োর খুরির খোঁজ না করতে এলেই যেন ভাল হত, কেবলি ওঁর মনে হয়। মনে মনে সনাতনের মুণ্ডপাত করেন ওঁরা।

এমন সময়ে সেই মেমটি বড়-সাহেবের খাসকামরা থেকে বেরিয়ে আসে।

"হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার বাবু?"

হর্ষবর্ধন তটস্থ হয়ে ওঠেন,—"ইয়েস সার!"

"ডোণ্ট সার মি! সে—ম্যাডাম।"

"ইয়েস সার!" পুনরুক্তির কোথায় ত্রুটি ঘটছে হর্ষবর্ধন বুঝতে পারেন না—ভারি বিব্রত হন। মেমটা এবার দাবড়ি ছ্যায় —"সে—ম্যাডাম!"

—"ইয়েস ড্যাম।"

—"হু দি ডেভিল ইউ!"

মেমটা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

"তুমি ড্যাম বললে কিনা, মেমটা চটে গেল তাইতে।" গোবর্ধন উল্লেখ করে।

"হ্যাঁ, আমি ওকে মা বলতে যাই আর কি!" হর্ষবর্ধন ঈষতুষ্ণই হন—"আমার বাবা কি ওকে বিয়ে করতে গেছে সাতপুরুষে!"

"মা কেন? ম্যা তো। বললেই পারতে!"

"মা-ও যা ম্যা-ও তাই—একই মানে।" হর্ষবর্ধন টীকা করেন—"আমাদের ভাষায় যাকে মা বলি, ওদের ভাষায় তাকেই বলে ম্যা।"

গোবরা আপত্তি করতে যায়, কিন্তু ওর কথায় কান ছান না হর্ষবর্ধন।

"ইংরিজির তুই কী জানিস? তুই শেখাবি আমাকে? আমাকে আর শেখাতে হয় না ইংরিজি!"

"কিন্তু চটে গেল তো মেমটা!" গোবর্ধন তথাপি কিন্তু-কিন্তু।

"বয়েই গেল আমার! মেয়ে-ইংরেজ দেখে ভয় খাইনে আমি! আমি কি তোর মত কাপুরুষ?" বীর বিক্রমে ভাইকে

বিধ্বস্ত করে ছ্যান তিনি।

"ছাগলরাও তো ম্যা বলে। তুমি কি বলতে চাও যে ছাগলরাও তাহলে ইংরেজ?" বেশ গুরু-গম্ভীর মুখেই গোবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

"বেড়ালেও তো ম্যাও বলে, তবে কি তুই বলছিস যে বেড়ালরা সব ছাগল?" হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না—"যদি আমার মত অনেক ভাষা তুই জানতিস তাহলে আর এ কথা বলতিস না। ইতর প্রাণীদের ভাষার মধ্যে ওরকম মিল প্রায়ই থাকে। না থেকে পারে না।" ভায়ের বোধোদয়ের জন্যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না তাঁর।

অনেক ভাষা না জেনেও ক্ষোভ যায় না গোবধনের। সে খুঁত-খুঁত করে তবুও—"ছাগলের ভাষায় আর ইংরেজের ভাষায় তোমার কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি দাদা; ছাগলের ভাষা শিখতে দেরি লাগে না, ইস্কুলে না গেলেও চলে; কিন্তু ইংরেজের ভাষা শেখা শক্ত কত!"

"শক্ত না ছাই! তোর মত ছাগলের কাছেই শক্ত!" হর্ষবর্ধন গোঁফ চুমরে নেন—"আমার কাছে জল!"

এবার গোবর্ধন চটে। বলে বসে—"তাহলে বল দেখি খুরির ইংরিজি?"

"কেন, বানান তো করেছি? কে এইচ ইউ—"

"বানান করা আর ইংরিজি করা এক হল?"

"পারব না নাকি ইংরিজি করতে? পারবনা বুঝি?" হর্ষবর্ধন কথা চিবুতে শুরু করেন—"এমন কী শক্ত কথা শুনি? এক্ষুনি করে দিচ্ছি।" হর্ষবর্ধন স্মৃতির ক্ষেত্র চষে ফেলতে থাকেন—সেই কৃষিকার্যের দাগ পড়তে থাকে তাঁর কপালে। দারুণ পরিশ্রমে

তিনি ঘেমে ওঠেন।

গোবর্ধন গুম হয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে।

নিতান্তই মুষড়ে এসেছেন, এমন সময় এক আইডিয়া আসে তাঁর মাথায়—ডুবন্ত লোকে যেমন কুটো খুঁজে পায়। ডুবন্ত লোকেরাই পায়, পাওয়াই দস্তুর,—ডুবন্তরা আর কুটোরা প্রায় কাছাকাছি থাকে কিনা! কুটোর জন্যেই তো ডোবা, তাও না পেলে কে আর কষ্ট করে ডুবতে যাবে বলো?

"পেয়েছি! পেয়েছি ইংরিজি!" হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

"কী, শুনি?" গোবর্ধন সন্দেহের হাসি হাসে।

"পেয়েছি। মানে, আরেকটু হলেই পেয়ে যাই।" হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন,—"মানুষের পিঠে সেই যে কী হয় বল্ দেখি তুই, তাহলে এক্ষুনি আমি বলে দিচ্ছি।"

বিরাট আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে বৈজ্ঞানিকের ভাবভঙ্গী যেমন হয়,—হর্ষবর্ধনের চোখ-মুখের এখন সেই অবস্থা—"বল্ না কী হয় পিঠে?"

"পিঠে তো চুল হয় না।" গোবর্ধন ঘাড় চুলকোয়—"কারু-কারু বুকে হতে দেখেছি অবিশ্যি!"

"যা হয় না আমি কি তাই জিগসে করেছি?" হুমকি দেয় হর্ষবর্ধন।

"পিঠে তবে কী হয়? শিরদাঁড়া?"

"সে তো হয়েই আছে। আবার হবে কী?" ভারি বিরক্ত হন তিনি—"আহা সেই যে—যা হলে কেটে বাদ দিতে হয়, তবেই মানুষ বাঁচে। আবার প্রায়ই বাঁচে না।"

"কুঁজ নাকি দাদা?"

"তোর মাথা! বাবা কি আর সাধে নাম দিয়েছিল গোবর্ধন! কেবল গোবর মাথায়।"

"কেন, কুঁজই তো হয় পিঠে। কুঁজ ছাড়া আর কী হবে? তুমি কি বলতে চাও তবে গোদ? না, গলগণ্ড?"

"আহা, সেই যে সনাতনখুড়োর যা হয়েছিল একবার! জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন করল শেষে?"

"ও! কার্বাঙ্কল?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কার্বাঙ্কল। এইবার পাওয়া গেছে!" হর্ষবর্ধনের মুখ যেন হাসিখুশির একখানা পৃষ্ঠা হয়ে যায়—"কার্বাঙ্কল থেকে এল আঙ্কল। আঙ্কল মানে খুড়ো—তাহলে খুড়ি মানে কী? বল্‌তো!"

"আমি কী জানি!" গোবর্ধন ঠোঁঠ ওলটায়—"তুমিই তো বলবে!"

"আহা, আমিই তো বলব! তুই বলবি কোথেকে? তোর কি বিদ্যে আছে অত? তাহলে ঘোড়ার পিঠে পাখি না বসে গাধার পিঠে গিয়ে বসত! নামই পালটে যেত তোর! খুরির ইংরিজি?—" মৃদু মধুর হাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল ভরে যায়—"খুরির ইংরিজি হল আণ্ট। আণ্ট মানে খুরি।"

"জানতাম। তোমার আগেই জানতাম।" মুখ বাঁকায় গোবর্ধন। "আবার আণ্ট মানে পিঁপড়েও হয়।"

"হয়ই তো।" হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জাহির করেন। "আণ্ট তো দু'রকমের—এক, পিঁপড়েরা, আর এক খুড়ি-জেঠি। আমি বললুম বলেই জানলি, নইলে আর জানতে হত না তোকে! আমার জানা আছে!"

গোবর্ধন অনেকটা কাহিল হয়ে আসে—"আচ্ছা বেশ, আণ্ট

বানান কর দেখি !"

"কেন ? সোজাই তো বানান। এ-এন-টি—আণ্ট। 'এ'-তে 'অ'-ও হয় 'আ'-ও হয়। ইংরিজির মজাই ঐ !" মুরুব্বি চালে উনি মাথা চালেন।

"আবার 'এ'-ও হয়।" গোবর্ধন অনুযোগ করে। দাদার অগ্রগতির ধাক্কা সামলানো ওর পক্ষে শক্ত, তবু খুব বেশি পিছিয়ে থাকতেও রাজি নয় ও।

"আচ্ছা, সে তো হল। খুরি তো পাওয়া গেল। এখন মাখন-কলের ইংরিজি পেলেই তো হয়ে যায়—সাহেবকে বুঝিয়ে খুঁজে বার করাই জিনিসটা।" হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—"জানিস ওর ইংরিজি ?"

"মাখন-কল ? কলের ইংরিজি তো মিল। যেমন পেপার মিল—"

হর্ষবর্ধন উৎসাহ পান—"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। সেই যে একবার কোন্ পেপার মিল একরকমের কাঠের খোঁজ করেছিল আমাদের কাছে ?"

"হ্যাঁ, আমারও মনে পড়েছে।" গোবর্ধন সায় ছায়—"আর মাখন ? মাখন হচ্ছে বাটার—জানোই তো তুমি। বাট—বাটার—বাটেস্ট। বাট মানে হল—কিন্তু, বাটার মানে —মাখন—আর বাটেস্ট ? বাটেস্ট্র মানে ?"

বিদ্যার পরিচয় দেবার মুখেই হোঁচট খেতে হয় গোবরাকে।

"বাটেস্টে কী কাজ আমাদের ? বাটারই যথেষ্ট।" হর্ষবর্ধন বলেন—"তাহলে মাখন-কল মানে হল, বাটার-মিল। কেমন তো ?"

দাদাকে পরামর্শ দেবার সুযোগ পেয়ে গোবর্ধন যেন গলে যায় : "মিল আবার কবিতারও হয় দাদা !" সে বলে—"তবে

কবিতার কলকারখানা হল আলাদা।"

"তুই বড্ড বাজে বকিস গোবরা!" হর্ষবর্ধন একটু বিরক্তই হন—"তাহলে কী দাঁড়াল? তাহলে সাহেবকে গিয়ে এই কথা বলা যাক—কেমন?"

এমন সময় বেয়ারাটা আবার আসে—"চলিয়ে চেম্বারমে বড় সাবকো পাস।"

দুরু-দুরু বক্ষে দু'ভাই আপিস ঘরে ঢোকে। অভিধানের মতই প্রকাণ্ড বটে ঘরটা, তবে ততটা ভয়াবহ নয়। দুজনে গিয়ে দাঁড়ায় টেবিলের কাছে।

"হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট বাবু?" প্রশ্ন এবং চুরুটের ধোঁয়া প্রকাণ্ড এক লাল মুখের দু'পাশ দিয়ে একই সময়ে এক সঙ্গে বহির্গত হয়।

হর্ষবর্ধন সাহস সঞ্চয় করেন—"উই ওয়্যাণ্ট ইওর আণ্ট"—

হর্ষবর্ধনের বাক্য শেষ হতে পায় না, সাহেবের চুরুট চমকে ওঠে মাঝখানেই—"হোয়াট?"

হর্ষবর্ধন একটু জোর পান এবার—"উই ওয়াণ্ট ইওর আণ্ট অফ এ বাটার-মিল।"

"ইউ ওয়াণ্ট মাই আণ্ট?" গোল চোখ আরও গোলাকার হয়ে আসে সাহেবের—"ইজ ছাট সো?"

গোবর্ধন জবাব দেয়—"ইয়েস—সার।" কম্পিত কণ্ঠ ওর।

সাহেবের মুখ থেকে চুরুট পড়ে যায়, এবং দাঁত কড়মড় করে। কোট খুলে টেবিলের উপর ফেলে ছ্যায়—আস্তিন গুটোয় সে—মাংসপেশীবহুল বিরাট হাত বিরাটতর বদ্ধমুষ্টিতে পরিণত হতে থাকে।

এই বদ্ধমুষ্টি অকস্মাৎ হয়ত ওদের নাকের সম্মুখীন হতে পারে,

কেন জানি না এই রকম একটা ক্ষীণ আশঙ্কা হতে থাকে গোবরার।

প্রায় তাই—

"ওরে দাদারে—!"

দুর্ঘটনার পূর্বমুহূর্তেই গোবর্ধন দাদাকে জাপটে ধরে উদ্যত মুষ্টিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ঊর্ধ্বশ্বাস হয়। বেরুবার মুখে মেমের পা মাড়িয়ে ছ্যায়, বেয়ারার সঙ্গে কলিশন বাধে, ধাক্কা লেগে একটা শো-কেস যায় উল্টে, বাঙালী বাবুটি ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্ট হয়ে কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ে কে জানে!—এসব দিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর কোথায় তখন? একেবারে চৌমাথায় গিয়ে হাঁপ ছাড়েন ওঁরা।

"বাব্বাঃ! খুব বেঁচেছি!" গোবর্ধন বলে।

"আরেকটু হলেই—হুঁ! হাঁপাতে থাকে হর্ষবর্ধন।

"বাজার করা সোজা নয় কলকেতায়!" গোবর্ধন বলে—"বুঝলে দাদা?"

"সনাতনখুড়োর যেমন কাণ্ড!" হর্ষবর্ধন বেজায় রুষ্ট হন—"কলকেতায় খুরি কিনতে পাঠিয়েছে! খুরিদের জন্যে প্রাণে মারা পড়ি আর কি!"

"একটা বিয়ে করলেই তো পারে বাপু!" দারুণ অসন্তোষে গোবর্ধনও তেতে ওঠে—"খুরির দুঃখ আর থাকে না! মাখন-কলেও লাগিয়ে রাখতে পারে দিনরাত!"

"যা বলেছিস গোবরা!" হর্ষবর্ধন ভায়ের তারিফ করেন—"একটা কথার মত কথা বলেছিস এতক্ষণে!"

"হ্যাঁ তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! একটা সনাতন খুড়ি হয়!"

"আমি শুধু ভাবছি, ব্যাটারা খুরি বোঝে না, আণ্টও বোঝে না —কী আশ্চর্য! এই বিদ্যে নিয়ে হল্যাণ্ড থেকে ব্যবসা করতে এসেছে হেথায়! আশ্চর্য!" হর্ষবর্ধন ক্রমশঃই বেশি অবাক হন— "কী করে যে এরা দোকান চালায় খোদাই জানেন! যে লালমুখোটা প্রথমে এগিয়ে এল সেটা তো আস্ত একটা আকাট! খুরি বানান বলে দিলুম তবু বুঝতে পারে না!"

"একেবারে হলধর!"

"হ্যাঁ, সেইটেই হলধর। ঠিক বলেছিস তুই।" হর্ষবর্ধন ভাইয়ের কথাই মেনে নেন—অম্লান বদনেই।

"আর যেটা অভিধানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে,—মুখ গোঁজ করে, ঘুসি পাকিয়ে—"

ধীরে ধীরে রহস্যকে বিস্তারিত করেন তিনি ঃ

"—সেই ব্যাটাই হল—ইন্দ্রসেন। আসল ইন্দ্রসেন!"

কালান্তক লালফিতা

আমি আত্মহত্যা করার পর দিনকতক তাই নিয়ে খুব জোর হৈ-চৈ হয়েছিল। গত ১৯৩৩ সালের দোসরা এপ্রিলের কাগজে-কাগজে কেবল এই কথাই ছিল। বেশিদিনের কাণ্ড নয়, অতএব তোমাদের মনে থাকতেও পারে।

আত্মহত্যার খবরটাই শুধু তোমরা পেয়েছ, কিন্তু কেন এবং কোন্ দুঃখে যে এজন্যে আর কাউকে না বেছে নিয়ে হঠাৎ নিজেকেই খুন করে বসলাম—তার নিগূঢ় রহস্য তোমরা কেউই জানো না। সেই মর্মন্তুদ কাহিনীই বল্‌বো এখানে। খুব সংক্ষেপেই বল্‌বো।

রেড-টেপিজম্ কাকে বলে, জানো তোমরা হয়তো। যদি কোনো আপিসে গিয়ে থাকো, তাহলে লালফিতায় বাঁধা ফাইল নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ, ফাইলের পর ফাইল সাজানো, বড়ো-বড়ো বাণ্ডিলের থাক্‌ও তোমাদের চোখে পড়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সরকারী দপ্তরখানায় তোমরা কখনও ঢুকেছ কিনা, জানি না, আমার একবার সেখানে ঢোকার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। আর তখন ঐরকম লালফিতার ফাইল—ফাইলের স্তূপাকার আর বাণ্ডিলের আণ্ডিল্ দেখেই হঠাৎ কেমন আমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেল; আর আমি ওই মারাত্মক কাণ্ড করে বসলাম!

লালফিতার একটা নিজের ধর্ম আছে। পৃথিবীতে যতো ism আবিষ্কৃত হয়েছে, Buddhism থেকে শুরু করে rheumatism পর্যন্ত, Red-Tapism তাদের কারুর থেকেই কম যায় না। আমার মতে এই লালফিতার ধর্মই সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত, কেননা,

পরকে আক্রমণ করতে আর করে কাবু করতে এর জুড়ি আর নেই।

এখন আসল ঘটনায় আসা যাক—

টিপু সুলতানই হোন বা তাঁর বাবা হায়দর আলিই হোন, অবিশ্যি আজকের কথা নয়, কোম্পানির আমলের কাহিনী—যাই হোক, ওঁদের একজন ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বেজায় বিরক্তির কারণ হয়ে পড়েন। হেষ্টিংস সাহেব সেই বিরক্তি দমন করতে না পেরে হায়দর আলিকেই দমন করবেন—এই স্থির করলেন। স্থির করেই তিনি কর্ণেল কূটকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিলেন হায়দরের উদ্দেশ্যে। সেই সময়ে অর্থাৎ সতেরোশো সাতাত্তর খৃষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিল নাগাদ, বিক্রমপুরের বলরাম পাঠকের সঙ্গে হেষ্টিংসের সরকারের এই চুক্তি হয় যে, উক্ত পাঠক উক্ত কর্ণেল কূটকে গোরাপল্টনের রসদ-বাবদে এক হাজার খাসী অথবা পাঁঠা সরবরাহ করবেন।

এই হোলো গোড়ার ইতিহাস অথবা আদিম কাণ্ড।

এত আগে শুরু করবার কারণ এই যে, এর সঙ্গে আমার অন্তিম কাণ্ড ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ক্রমশঃই সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

এখন বলরাম পাঠক প্রাণান্ত পরিশ্রমে একহাজার খাসী এবং পাঁঠা দিগ্বিদিক্ থেকে সংগ্রহ করে কলকাতার কেল্লার দরজা পর্যন্ত যখন তাড়িয়ে এনেছেন, তখন শুনতে পেলেন, কর্ণেল কূট পাঁঠাদের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করে সসৈন্যে মহীশূরের দিকে সটকে পড়েছেন কখন্।

বলরাম ভাবিত হয়ে পড়লেন, কি করবেন? সরকারী চুক্তি তো অবহেলার বস্তু নয়! পাঁঠার যোগাড়ে টাকা যোগাতে হয়েছে (কম টাকা না)! আর অতগুলো পাঁঠা (কিংবা খাসীই হোক)

একা কিংবা সপরিবারে খেয়ে খতম করা বলরামের একপুরুষের কম্ম নয় !

অনেক ভেবে-চিন্তে বলরাম স্থির করলেন, পাঁঠাদের সমভিব্যহারে তিনি কূটের অনুসরণ করবেন এবং কোথাও না কোথাও তাঁকে পাক্‌ড়াতে পারবেনই—তাহলেই তাঁর চুক্তি বজায় রাখা হবে।

অতএব যেমন এসেছিলেন, তেমনি তিনি চল্‌লেন পাঁঠা তাড়িয়ে কূটের পেছন-পেছন ধাওয়া করে মহীশূরের দিকে।

কটকে উপনীত হয়ে তিনি শুন্‌লেন, কূট আরও দক্ষিণে বহরমপুরের দিকে পাড়ি মেরেছেন ! তখন তিনিও পাঁঠাদের সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরের উদ্দেশে ধাবিত হলেন ; কিন্তু সেখানেও পৌঁছোলেন দেরি করে—দিনকয়েক আগে কূট চলে গেছেন হায়দ্রাবাদের অভিমুখে। অদ্ভুত এই কূটনীতি। কূটের চাল-চলনে বলরাম তো নাজেহাল্ হয়ে পড়লেনই, পাঁঠারাও হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল।

তারপর—তারপর আর কি ? হায়দ্রাবাদ থেকে এলোর, এলোর থেকে মছলিপত্তন, সেখান থেকে কোদ্দাপা (হাঁটতে হাঁটতে পাঁঠাদেরই চার পায়ে খিল ধরে গেল, বলরামের তো মোটে দুটো পা) ! এইরকমে তিনি কর্ণেলের পশ্চাদ্ধাবন করে চল্‌লেন, কিন্তু গোদা-পা নিয়ে কোদ্দাপা পার হয়েও কর্ণেলের পাত্তা তিনি পেলেন না। পল্টনের নাগাল পাওয়া তাঁর আর হোলো না। তিনি তো হয়রান হয়ে হাঁপিয়ে উঠলেনই, পাঁঠারাও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাহাত্তর দিন এইভাবে দারুণ দৌড়োদৌড়ির পর মহীশূরের প্রায় সীমান্তে এসে অবশেষে যখন তিনি কর্ণেল কূটের কাছাকাছি অর্থাৎ তাঁর ফৌজের ছাউনির চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছেন, তখন এক বর্গীর দল এসে তাঁর দলে হানা দিল। আক্রান্ত হয়ে তাঁর দলবল

এমন চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করলো যে, সে আর কহতব্য নয়! সেই দারুণ গণ্ডগোল আর ছত্রভঙ্গের ভেতর পাঠকমহাশয় (পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তখন তাঁরই এক সহযাত্রীর ঝোল বানিয়ে সবেমাত্র মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন!) ভাতের থালার অন্তরালে আত্মগোপন করতে যাবেন এমন সময় অতর্কিতে বর্শাবিদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রাণত্যাগ করতে হোলো!

বর্গীরা পাঁঠাদের নিয়ে পিঠটান দিল। সেই পলায়নের মুখে কয়েকটা পাঁঠা (অথবা খাসী) পথ ভুলেই হোক বা বর্গীদের সঙ্গ না-পছন্দ করেই হোক (সংখ্যায় অবিশ্যি তারা মুষ্টিমেয়), কর্ণেল কূটের ছাউনির মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং ধৃত হয়। বলা বাহুল্য, কর্ণেল সাহেব সসৈন্যে তাদের উদরসাৎ করতে দ্বিধা করেননি। সুতরাং রসদ্‌রূপে তাদের সদ্ব্যবহার হয়েছিল, বল্‌তে হবে। এইরূপে বীর বলরাম পাঠক মারা গিয়েও পাঁঠাদের সাহায্যে কোনোপ্রকারে আংশিকভাবে তাঁর চুক্তি বজায় রেখেছিলেন।

পাঠকমহাশয় মহীশূর-মহাপ্রস্থানের প্রাক্কালেই সরকারী চুক্তি-পত্রটি তাঁর ছেলে বাবুরামকে উইল করে দিয়ে যান। বাবুরাম তাঁর বাবা মারা যাবার খবর পাবামাত্র নিম্নলিখিত বিলটি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দরবারে পেশ করেন, করবার পর তিনিও খতম হন। বিলটি এই—

মহামান্য কোম্পানী-সরকার বরবরেষু—

বিক্রমপুরের বাবু বলরাম পাঠক সম্প্রতি বিগত, উক্ত মহাশয়ের প্রাপ্য-সম্পর্কে হিসাব..............হিঃ—

মান্যবর কর্ণেল কূটসাহেবের ফৌজের রসদের জন্যে এক্-হাজার পাঁঠা কিংবা খাসী প্রত্যেতটির মুল্য ৫৲ টাকা হিসাবে ৫০০০৲

মহীশূর পর্য্যন্ত তাহাদের যাতায়াত এবং

খোরপোষের খরচা-বাবদে ১৬০০০৲

একুনে, মোট— ২১০০০৲

বাবুরাম তো মরলেন, কিন্তু মরবার আগে তাঁর ভাগ্নে ত্রিবিক্রম মহাপাত্রকে ডেকে তার ওপর ভার দিয়ে গেলেন বিলের টাকাটা আদায় করবার। ত্রিবিক্রম উপযুক্ত পাত্র ; আদায়ের জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিক্রমের সূত্রপাতেই তাঁকে দেহরক্ষা করতে হয়। তাঁর থেকে দিগম্বর তরফদারের হাতে এলো ঐ বিল। কিন্তু তিনিও বেশিদিন বাঁচলেন না। তস্য ভ্রাতা সুদর্শন তরফদার ঐ উত্তরাধিকারসূত্রটি লাভ করলেন, কিছুদূর ঐ সূত্র টেনেও ছিলেন তিনি, এমন কি খাজাঞ্চিখানার সপ্তম সেরেস্তাদার পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছিলেন, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে কালের কঠোর হস্ত এমন আদর্শ অধ্যবসায়ের মাঝখানে অকস্মাৎ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

সুদর্শন তাঁর এক আত্মীয়ের হাতে এই বিল সমর্পণ করে যান, সে-বেচারা তার ঠেলায় মাত্র পাঁচ-হপ্তা পৃথিবীতে টিকতে পারলো। তবে এই অল্পসময়ের ভেতরেই সে রেকর্ড রেখে গেছে। লালফিতা-দপ্তরখানায় তেরোনম্বর সেরেস্তা সে পার হয়েছিল। তার উইলে এই বিল সে নিজের মামা আনন্দময় চৌধুরীকে উৎসর্গ করে যায়। আনন্দময়ের পক্ষে এই আনন্দের ধাক্কা সামলানো সহজ হয়নি। তারপর খুব অল্পদিনই তিনি এই ধরাধামে ছিলেন। অন্তিম-নিঃশ্বাসের আগে তাঁর বিদায়-বাক্য হচ্ছে এই—"তোরা আমার জন্যে কেঁদো না, বড় আনন্দেই আমি যেতে পারছি। মৃত্যু—হ্যাঁ—মৃত্যুই আমার পক্ষে এখন একমাত্র কাম্য।"

তিনি তো মরে বাঁচলেন, কিন্তু মেরে গেলেন আরো অনেককে। তারপর সাতজনের দখলে এই বিল আসে, কিন্তু তাদের কেউই আর এখন ইহলোকে নেই। অবশেষে এই বস্তু এলো আমার হাতে। আমার এক মামার হাত হয়ে।

আমার দূরসম্পর্কের খুড়্তুতো মামা—গুরুদাস গাঙ্গুলি—হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে আমাকে তার পাঠালেন। কোনোদিনই যে আমাদের মধ্যে প্রাণের টান ছিল, এমন কথা বলা যায় না; বরং বলতে গেলে বলতে হয়, বরাবরই তিনি আমার প্রতি অহেতুক বিরাগ পোষণ করতেন; কখনো তিনি সইতে পার্তেন না আমাকে, চিরকাল এইটেই দেখেছি, কাজেই টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক্ হয়ে ছুট্লাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি মৃত্যু-শয্যায়। কিন্তু অবাক্ হবার তখনো বুঝি কিছুটা বাকি ছিল। তিনি তো সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে মার্জনা করলেনই, এমন কি তাঁর প্রিয়পাত্রদের আর নিজের প্রিয়পুত্রদের বঞ্চিত করেই এই মুল্যবান সম্পত্তি অশ্রুপূর্ণনেত্রে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন।

আমার কবলে আসা পর্যন্ত এর ইতিহাস হচ্ছে এই।

মামাতো ভাইদের ডবল শোকাতুর করে একুশ হাজার টাকার এই বিল নিয়ে তো আমি লাফাতে-লাফাতে কলকাতা ফিরলাম। ফিরেই উঠে-পড়ে লেগে গেলাম টাকাটার উদ্ধারের চেষ্টায়। এক-আধ টাকা নয়, একুশ হাজার। ইয়াল্লা!

প্রথমেই গিয়ে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম। কার্ড পাঠাতেই কিছু পরে আমাকে তাঁর খাস্-কামরায় নিয়ে গেল।

আমাকে দেখবামাত্র তিনি প্রশ্ন করলেন—"হ্যাঁ, কি দরকার আমার কাছে? আমার সময় খুব কম, ভারি ব্যস্ত আমি, তা কি করতে পারি আমি তোমার জন্যে বলো দেখি?"

সবিনয়ে বল্লাম—"আজ্ঞে হুজুর, সতেরোশো সাতাত্তর খৃষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিল তারিখে বা ঐরকম সময়ে বিক্রমপুর জিলায় বাবু বলরাম পাঠক কর্ণেল কূটসাহেবের সঙ্গে মোট এক-হাজার পাঁঠা

কিংবা খাসী সরবরাহের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন—"

এই পর্যন্ত শোনামাত্র তিনি আমাকে বিদায় নিতে বাধ্য করলেন। এর বেশী কিছুতেই তাঁকে শোনানো গেল না। আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর টেবিলেয় কাগজপত্রে এমন গভীরভাবে মন দিলেন যে, স্পষ্টই বোঝা গেল—বলরাম, আমার বা পাঁঠার—কারো ব্যাপারেই তাঁর কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই।

পরের দিন আমি কৃষি-মন্ত্রীর সঙ্গে মুলাকাত করলাম।

"কি চাই ?" দেখেই আমাকে প্রশ্ন হোলো তাঁর।

"আজ্ঞে মহাশয়, সতেরেশো সাতাত্তর খৃষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিল নাগাদ বিক্রমপুর জেলার বাবু বলরাম—"

তিনি আমাকে বাধা দিলেন—"আমার মন্ত্রিত্ব তো মাত্র তিন বছরের, তিন শতাব্দীর তো নয়। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।"

তবে ? তিনশো বছরের প্রাচীন লোক আর কে আছে এখন ? কার কাছে যাব আমি ? ওয়ারেন্ হেষ্টিংসও তো এখন বেঁচে নেই ? তবে ? তাহলে ? আমি মনে-মনে ভাবি।

কি করব ? নমস্কার করে সেখান থেকে সরে পড়লাম।

পরের দিন ভয়ানক ভেবে-চিন্তে ভাইস্-চ্যান্সেলারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি মন দিয়ে আনুপূর্বিক শুনলেন। একটু চিন্তাও করলেন মনে হোলো। শেষে বল্লেন—"চতুষ্পদ পাঁঠা তো ? তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি সম্পর্ক ? তারা তো আমাদের ছাত্র না। ও-ব্যাপারে আমরা আর কি করতে পারি বলো ?"

অগত্যা সেখান থেকেও চলে আসতে হোলো।

কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কর্পোরেশন চলে, এই রকম একটা কথা কানে এসেছিল, সেখানে হয়তো এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হদিস মিলতে পারে, এইরকম ভেবে মেয়রের সঙ্গে দ্যাখা

করলাম তার পরদিন।

"মহাশয়, সতেরোশো সাতাত্তর খৃষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিলে বা ওর কিছু আগে বা পরে বিক্রমপুর-জিলানিবাসী, সম্প্রতি বিগত শ্রীযুক্ত বাবু বল্লরাম পাঠকের সঙ্গে কর্ণেল কূটসাহেবের এক চুক্তি হয় যে—"

এই পর্যন্ত কোনোরকমে এগুতে পেরেছি, মেয়রমহাশয় আমাকে থামিয়ে দিলেন—"কর্ণেল কূটের সঙ্গে কর্পোরেশনের কি? ওসব ব্যাপার এখানে নয়। তাছাড়া, কোনো রাজনৈতিক কূটনীতির মধ্যে আমরা নেই।"

সব্বাই একই কথা বলে। এখানে নয়, ওখানে নয়, সেখানে নয়, তবে কোন্‌খানে? চুক্তি হয়েছিল, এতো আলবৎ; সে-চুক্তি পাঁঠাদের তরফ থেকে যদ্দূর সম্ভব বজায় রাখাও হয়েছে। এখন টাকা দেবার বেলায় এইভাবে দায়-এড়ানোর অপচেষ্টা আমার একেবারেই ভালো লাগে না। এ যেন আমার একুশ হাজারের দাবী না দিয়ে মেরে দেবার মতলব! আমাকেই দাবিয়ে মারার ফন্দী!

পরদিন জেনারেল পোষ্টাপিসের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল তখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর মোটরের সম্মুখে গিয়ে ধর্‌না দিয়ে পড়লাম।

"কি চাও বাপু, চাক্‌রি?" গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে তিনি মুখ বাড়ালেন—"দুঃখের বিষয়, এখন কিচ্ছুই খালি নেই।"

"আজ্ঞে না, চাক্‌রি নয়!"

ভরসা পেয়ে তখন তিনি আরও একটু মুখ বাড়ান—"তবে কী চাই?"

"আজ্ঞে, ১৭৭৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে—"

"১৭৭৭ সাল?" ঈষৎ যেন ভ্রূকুঞ্চিত হোলো ওঁর—"সে তো এখানে নয়, ডেডলেটার-আপিসে। সেখানে খোঁজ করো গিয়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মোটর দিল ছেড়ে।

এর পর আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। যেমন করে পারি, এই বিলের কিনারা করবোই, এই আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হোলো। যদি প্রাণ যায় সেই দুশ্চেষ্টায়, সেও স্বীকার। হয় বিলের সাধন, নয় শরীর-পাতন! বিল নিয়ে আমি দিগ্বিদিকে হানা দিতে লাগলাম ; এ-ডিপার্টমেণ্টে, সে-ডিপার্টমেণ্টে, এ-আপিসে, সে-আপিসে—একে-ওকে তাকে ধরপাকড় শুরু করে দিলাম!

কোথায় না গেলাম? ক্যাম্বেল-হাসপাতাল, গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল, ডেডলেটার-আপিস, কমার্সিয়াল মিউজিয়ম, মেডিক্যাল কলেজ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, টেক্স্টাইল্ ডিপার্টমেণ্ট, টেক্স্ট্-বুক কমিটি, পল্‌তা-ওয়াটার ওয়ার্কস্—কত আর নাম করবো? আলিপুরের আবহাওয়াখানা থেকে আরম্ভ করে (এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামডিপোর আপিস ধরে) বেলগেছের ভেটার্‌নারি কলেজ পর্যন্ত কোন্‌খানে না ঢুঁ মারলাম! এককথায়, এক জেলখানা ছাড়া কোথাও যেতে আর বাকি রাখলাম না।

ক্রমশঃ আমার বিলের ব্যাপার কলকাতার কারু আর অবিদিত রইলো না। টাকাটা কেউ দেবে কিনা, কে দেবে এবং কেনই বা দেবে, আর যদি সে না দেয়, তাহলেই বা কি হবে, এই নিয়ে সবাই মাথা ঘামাতে লাগলো ; খবরের কাগজে-কাগজেও হৈ-চৈ পড়ে গেল দারুণ। একহাজার পাঁঠা আর একুশ হাজার টাকা—সামান্য কথা তো নয়। ভাবতে গেলে আপনা থেকেই জিহ্বা লালায়িত আর পকেট বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

অবশেষে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের অ-স্বাক্ষরিত পত্রে একটু যেন আশার আলোক পাওয়া গেল।

তিনি লিখেছেন—"আমি আপনার ব্যথার ব্যথী। আপনার মতই

ভুক্তভোগী একজন। আমারো এক পুরোণো বিল ছিল, এখন তা খালে পরিণত হয়েছে। এখন আমি সেই খালে সাতার কাটছি, কিন্তু কতক্ষণ আর কাটবো? কতক্ষণ কাটতে পারবো আর? আমি তো শ্রীবোকা ঘোষ নই! শীঘ্রই ডুবে যাবো, এরূপ আশা পোষণ করি। যাই হোক, আপনি সরকারী দপ্তরখানাটা দেখেছেন একবার?"

তাইতো, ওইটেই তো ছাখা হয়নি। গোলমালে অনেক কিছুই দেখেছি—দেখে ফেলেছি, শুধু ওইটা বাদে! খোঁজখবর নিয়ে ছুটলাম দপ্তরখানায়। গিয়ে সোজা একেবারে সেখানকার বড়বাবুর কাছে আমার সেলাম ঠুক্‌লাম।

"মশাই, বিগত ১৭৭৭ সালের পয়লা এপ্রিলে বিক্রমপুরের স্বর্গীয়—'

"বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। আপনিই সেই পাঁঠা তো?"

"আজ্ঞে, আমি পাঁঠা…? আমি…" আম্‌তাআম্‌তা করি আমি—"আজ্ঞে, পাঁঠা ঠিক না হলেও পাঁঠার তরফ থেকে আমার একটা আর্জি আছে। বিগত ১৭৭৭ সালের পয়লা—"

"জানি, সমস্তই জানি। কর্ণেল কুটের রসদ-সংক্রান্ত ব্যাপার তো! বটে কিনা? ওর হাড়হদ্দ সমস্তই আমার জানা। সব এই নখদর্পণে। কই, দেখি আপনার কাগজপত্র?"

এরকম সাদর আপ্যায়ন এপর্যন্ত কোথাও পাইনি। আমি উল্লসিত হয়ে উঠি। বলরামের আমলের বহু পুরাতন চুক্তিপত্রটা বাড়িয়ে দিই। বাবুরামের আমলের বিলও। হাতে নিয়ে দেখে-শুনে তিনি বলেন—হ্যাঁ, এই কণ্ট্রাক্টই বটে।"

তাঁর প্রসন্ন হাসি দেখে আমার প্রাণে ভরসার সঞ্চার হয়। হ্যাঁ, এতদিনে ঠিক জায়গায়, একেবারে যথাস্থানে পৌঁছোতে পেরেছি

বটে। তখন সেই ভুক্তভোগীটিকে আমি মনে-মনে ধন্যবাদ জানাই।

তারপরই তিনি কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন। এ-ফাইল, সে-ফাইল, এ-দপ্তর, সে-দপ্তর! এর লালফিতা খোলেন, ওর লালফিতা বাঁধেন। দপ্তরীকে তলব দেন, আরো ফাইল আসে। আরো—আরো ফাইল। গভীরভাবে দেখা-শোনা চলে। আবার তলব, আরো বহুপুরাতন বাণ্ডিলরা এসে পড়ে।

হ্যাঁ, এইবার কাজ এগুচ্ছে বটে। আমারই কাজ। সমস্ত মন ভয়ানক খুশিতে ভরে ওঠে। সারা কড়িকাঠ জুড়ে যেন ঝমাঝম্ আওয়াজ শোনা যায় টাকার। এক্ষুণি সশব্দে আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়লো বলে। আমিও সেই দৈবদুর্ঘটনার তলায় চাপা পড়বার জন্যে প্রাণপণে প্রস্তুত হতে থাকি। হৃদয়কে সবল করি।

অনেক অন্বেষণের পরে বলরামী চুক্তিপত্রের সরকারী ডুপ্লিকেট অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে! অর্থাৎ করতে বাধ্য হয়।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত মিলিয়ে দেখে তিনি ঘাড় নাড়েন—"কাজ তো অনেকটা এগিয়েই রয়েছে, তা এতোদিন আপনারা কোনো খবর ন্যাননি কেন?"

"আজ্ঞে, আমি নিজেই এ বিষয়ের খবর পেয়েছি খুব অল্পদিন হোলো।"

সরকারী দপ্তরের ডুপ্লিকেটটা সসম্ভ্রমে হাতে নিই। হাঁা, এই সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ, যার দরজায় মাথা ঠুকে আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষ ইতিপূর্ব্বে গতাসু হয়েছেন এবং আমিও প্রায় যাবার দাখিল! ভাবের ধাক্কায় আমার সমস্ত অন্তর যেন উথলে ওঠে—যাক, এই রক্ষে যে, আমাকে আর তাঁদের অনুসরণ করতে হবে না। এ-আনন্দ আমার কম নয়। আমি তো বেঁচেই গেছি এবং আরো ঘোরতরভাবে বাঁচবো অতঃপর—বালিগঞ্জের বড়লোকদের মধ্যে সটান নবাবী স্টাইলে

থাকব, পুলকের আতিশয্যে আমি কাবু হয়ে পড়ি।

ভদ্রলোক সমস্তই উল্টে-পাল্টে ছাখেন—"হ্যাঁ, সুদর্শন তরফদার। সুদর্শনবাবুই তো কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছেন দেখছি। সাতটা সেরেস্তার সই তাঁর সময়েই হয়েছে। তাঁর পরে এলেন—কি নাম ভদ্রলোকের? ভালো পড়াও যায় না! পুরন্দর পাত্রনবিশ? হ্যাঁ, পুরন্দরই বটে, তা তিনিও তো ছটা সই বাগাতে পেরেছেন দেখছি। আর বাকি ছিল মাত্র চারটে সই। চারজন বড়কত্তার। তার পরের ভদ্রলোক তো আনন্দময় চৌধুরী! আপনার কে হন তিনি?"

"আজ্ঞে, তা ঠিক বল্‌তে পারবো না।" আমি নিজের মাথা চুল্‌কোই—"অনেকদিন আগেকার কথা। তবে কেউ হন নিশ্চয়ই।"

"তা, তিনিও তুটো সই আদায় করেছেন। বাকি ছিল আর তুটো সই। তিনি আর একটু উঠে-পড়ে লাগলেই তো কাজটা হয়ে যেতো। তা, তিনি আর চেষ্টা করলেন না কেন? এরকম করে হাল ছেড়ে দিলে কি চলে?"

"খুব সম্ভব তিনি আর চেষ্টা করতে পারলেন না। কারণ তিনি মারা গেলেন কি না! চেষ্টা করতে-করতেই মারা গেলেন।"

"ও, তাই নাকি? কিন্তু তার পরে কাজ আর বিশেষ এগোয়নি। তু'জন বড়কত্তার সই এখনো বাকিই রয়েছে। তবে এইবার হয়ে যাবে সব।"

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ! মশাই, যাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়, অনুগ্রহ করে—"

তিনি বাধা দিয়ে বললেন—"দেখুন তাড়াতাড়ির আশা করবেন না। এসব হচ্ছে সরকারী কাজ—দরকারী কাজ—বুঝতেই তো পারছেন? অতএব ধীরে-সুস্থে হবে। স্লোলি, বাট্ শিওর্‌লি। এর বাঁধা-দস্তুর চাল আছে, সবই রুটিনমাফিক, একটু এদিক্-ওদিক হবার

যো নেই! একেবারে কেতাদুরস্ত!" এই বলে মৃদুহাস্যে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন—"আস্তে-আস্তে হয়ে যাবে সব, কিচ্ছু ভয় নেই আপনার।"

অভয় পেয়ে আমার কিন্তু হৃৎকম্প শুরু হোলো। "তবু একটু স্মরণ রাখবেন অধীনকে, যাতে ওর মধ্যে একটু চট্‌পট্‌—" করুণস্বরে বলতে গেলাম।

"বল্‌তে হবে না, বল্‌তে হবে না অতো করে। সেদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকে বইকি! এতো বড়ো দপ্তরখানা তবে হয়েছে কিজন্যে বলুন? আর আমরাই বা এখানে বসে করছি কি? রয়েছি কিজন্যে? তবে আর একবার আগাগোড়া সব চেক্ হবে কিনা, সেইটুকু হলেই যথাসময়েই আপনি কল্ পাবেন। আপনাকে বার-বার আসতে হবে না কষ্ট করে, আমরাই চিঠি দিয়ে জানাবো আপনাকে। আর দুটো সই বইতো নয়! আর কি?"

অন্তরে বল সঞ্চয় করে বাড়ী ফিরি। তারপর একে-একে দশবছর কেটে যায়। খবর আর আসে না! বিলের ভাবনা ভেবে-ভেবে চুল-দাড়ি সব পেকে ওঠে, পেকে, ঝরে, ফাঁকা হয়ে যায় সব। কেবল থাকে—মাথার ওপরে টাক, আর মাথার মধ্যে টাকা; কিন্তু খবর আর আসে না।

বিলক্ষণ দেরী দেখে আর বিলের কোনো লক্ষণ না দেখে মাঝে-মাঝে আমি নিজেই তাড়া করে যাই, খবরের খোঁজে হানা দিই গিয়ে। "অনেকটা এগিয়েছে", "আর একটু বাকি", "আরে, হয়ে এলো মশাই, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?" "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? হয়ে যাবে —হয়ে যাবে।" "সময় হলেই হবে, ভাববেন না, ঠিক হবে!", "সবুরে মেওয়া ফলে, জানেন তো?" ইত্যাদি সব আশার বাণী শুনে চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসি। তারপর আবার বছর ঘুরে যায়।

অবশেষে ১৯৩৩ সালের মার্চমাসের শেষ-সপ্তাহে বহুবাঞ্ছিত চিঠি এলো। তাতে পরবর্তী মাসের পয়লা তারিখে উক্ত বিলসম্পর্কে দপ্তরখানায় দেখা করবার জন্যে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যাক, এতদিনে তাহলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়িল। আমি মনে-মনে লাফাতে শুরু করে দিলাম। আর কি, মার দিয়া কেল্লা, কে আর পায় আমায়! সটান্ বালিগঞ্জ! কি সোজা নিউইয়র্ক! কিংবা হলিউড্‌ই বা মন্দ কি? জীবনের ধারাই এবার পাল্টে দেবো বিলকুল—বিলের যখন কূল পেয়েছি! হ্যাঁ! আধঘণ্টা পরে পা মচ্‌কে বসে পড়বার পর খেয়াল হোলো যে, ও হরি! কেবল মনেই নয়, বাইরেও লাফাতে আরম্ভ করেছি কখন্!

পয়লা এপ্রিল তারিখে দুরু-দুরু-বক্ষে দপ্তরখানার দিকে এগুলাম। সতেরোশো সাতাত্তর সালের পয়লা এপ্রিলে যে নাটক শুরু হয়েছিলো, আজ উনিশশো তেত্রিশ সালের আর এক পয়লা এপ্রিলে সেই বিরাট্ ঐতিহাসিক পরিহাসের যবনিকা পড়ে কিনা, কে জানে!

দপ্তরখানার সেই বাবুটি সহাস্যমুখে এগিয়ে আসেন। "ভাগ্যবান্ পুরুষ মশাই আপনি! কাজটা উদ্ধার করেছেন বটে!" বলে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দ্যান একবার।

"একুশ হাজারই পাবো তো মশাই?" ভয়ে-ভয়ে আমি জিগ্যেস করি।

"একুশ হাজার কি মশাই! এই দেড়শো বছরে সুদে-আসলে আড়াই লাখের ওপর দাঁড়িয়েছে যে! বলছি না—আপনি লাকী লোক!" তিনি বলেন।

আড়াই লাখ! আমার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে—"তা, চেক্‌টা আজই পাচ্ছি তাহলে?"

"চেক্ ? এখনই ? তবে হ্যাঁ, আর বেশি দেরি নেই।"

"বেশ, আমি অপেক্ষা করছি—সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত।"

"না, আজ হবার আশা কম। আপনি শুধু সই করে যান এখানে। পরে আমরা খবর দেবো আপনাকে।"

"অ্যাঁ! এখনো পরে? পরে-খবরের ধাক্কায় তো দশবছর কাট্‌লো, আবার পরে-খবর? সসঙ্কোচে বলি—"আজ্ঞে, আজ আপনাদের অসুবিধাটা কি হচ্ছে, জানতে পারি কি?"

"এখনো একটা সই বাকি আছে কিনা!" গূঢ়-রহস্যটা অগত্যা তিনি ব্যক্ত করেন।

"এখনো একটা সই বাকি!" শুনে আমার মাথা ঘুরে যায়! এখনো আরো একটা! তবেই হয়েছে। ও আড়াই লাখ আমার কাছে তাহলে আড়াই পয়সার সামিল!

ক্যালেণ্ডারে আজকের তারিখের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটু হাস্‌ব্যর ভান করি—"পয়লা এপ্রিল বলে পরিহাস করছেন না তো মশাই?"

"না-না, পরিহাস কিসের!" তিনি গম্ভীরভাবেই বলেন—"শুধু সেই ফাইন্যাল সইটা হলেই হয়ে যায়।"

ততক্ষণে আমার মাথায় খুন চেপে গেছে; আমি বল্‌তে শুরু করেছি—"তবে দিন মশাই, দিন আমাকে কাগজ-কলম! আমার এই বহুমূল্য সম্পত্তি আমি এই দণ্ডে আপনাকে ও ভগবান্‌কে সাক্ষী রেখে উইল করে দিয়ে যাচ্ছি আমার জাতিকে, মানে—আমার দেশবাসীকে—অনাগত-কালের যতো ভারতীয়দের! দেখুন, আমরা সব নশ্বর জীব। অল্পদিনের আমাদের জীবন, বেশীদিন অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। বিল মানেই বিলম্ব—বিলক্ষণ বিলম্ব! জাতির অখণ্ড পরমায়ু—কেবল সে-ই অপেক্ষা করতে পারে অনন্ত-

কাল, মানে—যদ্দিন তার খুশি।”

এই কথা বলে সামনের টেবিল থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে আমূল বসিয়ে দিই আমার নিজের বুকে অম্লানবদনে।

“উইল করে দিচ্ছি বটে, তবে আমার স্বদেশবাসী যেন না ভুল বোঝে যে, তাদের ওপর আমার খুব রাগ ছিল, তারই প্রতিশোধ নেবার মানসে এই বিল তাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম—আমাকে যেন তারা মার্জনা করে!” এই বলে সব শেষ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস দিয়ে আমার অন্তিম বাণীর উপসংহার করি।

আড়াই লাখের বিল আমার দেশবাসীকে বিলিয়ে দিয়ে সেই-ই আমার শেষ বিলাসিতা!

———

ঘোড়ায় চড়ার ব্যায়াম

আর কিছু না, একটু মোটা হতে শুরু করেছিলাম, অমনি মামা আমার ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন। বল্লেন—“সর্বনাশ! তোর খুড়্‌তুতো দাদামশাই মোটা হয়েই মারা পড়্‌ল যে! তুইও আবার মোটা হচ্ছিস্! তোর জ্যেঠ্‌তুত দাদামশাই—কি সর্বনাশ!”

কথাটা শেষ কর্‌বার দরকার হয় না। আমার মাতুলের খুড়ো আর জ্যেঠা স্থূলকায়তার সর্বনাশের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। নামের উল্লেখেই আমরা বুঝতে পেরে যাই।

খুড়্‌তুত দাদামশায়ের বুকে এত চর্বি জমেছিল যে হঠাৎ হার্ট্‌ফেল হয়েই তাঁকে মারা যেতে হ’ল, ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন হয় নি। জ্যেঠ্‌তুত দাদামশায়ের বেলা অবশ্য ডাক্তার ডাকার সুযোগ পাওয়া গেছ্‌ল, কিন্তু ডাক্তার ইন্‌জেক্‌সন্ করতে এসে মাংসের স্তর ভেদ ক’রে শিরা খুঁজে না পেয়ে, গোটা চারেক সিরিঞ্জ্ ভেঙ্গে এবং গোটা তিনেক ছুঁচ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গচ্ছিত রেখে, রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় ভিজিট্ না নিয়েই বেগে প্রস্থান করেছিলেন।

যে-বংশের দাদামশায়দের এরূপ মর্মভেদী ইতিহাস, সে-বংশের নাতিদের মোটা হাতী হওয়ার মত ভয়াবহ আর কি হতে পারে? কাজেই বড় মামা বিচলিত হয়ে পড়েন।

প্রতিবাদের সুরে বলি—“কি করব! আমি কি ইচ্ছে ক’রে হচ্ছি?”

“উহুঁ, আর কোন অসুখে ভয় খাই না। কিন্তু মোটা হওয়া—বাপরে! অমন মারাত্মক ব্যাধি আর নেই! সব ব্যায়রামে

পার আছে, চিকিচ্ছে চলে ; কিন্তু ও-রোগেয় চিকিচ্ছেই নেই। ডাক্তার কব্‌রেজ্‌ হার মেনে যায়। হুঁ।"

অগত্যা আমাকে চেঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, রোগা হবার জন্য। গৌহাটিতে বড় মামার জানা একজন ভালো ডাক্তার থাকেন ; সেখানেই যাই। তিনিই আমাকে রোগা করবার ভার নেন।

প্রথমেই তাঁর প্রশ্ন হয়—"ব্যায়াম-ট্যায়াম কর ?"

"আজ্ঞে দু বেলা হাঁটি। দু মাইল, দেড় মাইল, আধ মাইল পর্যন্ত—যেদিন যতটা পারি। রাস্তায় বেরুলেই হাঁট্‌তে হয়।"

"হ্যাঁঃ! হাঁটা আবার একটা ব্যায়াম্‌! ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে ?"

"না তো!" সসঙ্কোচে বলি।

"ঘোড়ায় চড়াই হ'ল গিয়ে ব্যায়াম। পুরুষ মানুষের ব্যায়াম। ব্যায়ামের মত ব্যায়াম! একটা ঘোড়া কিনে ফেলে চড়্‌তে শেখো —দুদিনে শুকিয়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়্‌বে।"

ডাক্তারের কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। গোরু থেকে ঘোড়ার পার্থক্য সহজেই আমি বুঝ্‌তে পার্‌তাম, যদিও রচনা লিখতে বসে আমার পক্ষে সে পার্থক্য বজায় রাখা খুব সহজ ছিল না। আমার 'এসে'তে ঘোড়া-গরু এক হয়ে এসে মিলে যেত, সেই একতার মধ্যে থেকে ওদের আলাদা করা ইস্কুলের পণ্ডিতের পক্ষে কষ্টকর ছিল। চতুষ্পদের দিক্‌ থেকে উভয়ে প্রায় এক জাতীয় হলেও, বিপদের দিক্‌ থেকে বিবেচনা করলে ঘোড়ার স্থানই কিছু উঁচুতে হবে মনে হয়।

যাই হোক, গৌ-হাটির ডাক্তার হলেও, গোরুকে বাতিল ক'রে ঘোড়াকেই তিনি প্রথম আসন দিতে চাইলেন ; অবশ্য আমার নাচেই। আমিও, ঘোড়ার উপরেই চড়ব, এই স্থিরসংকল্প ক'রে

ফেললাম। বাস্তবিক, ঘোড়ায় চড়া—সে কী দৃশ্য! সার্কাসে তো দেখেইছি, রাস্তাতেও মাঝে মাঝে চোখে প'ড়ে যায়।

আম্বালায় থাক্‌তে ছোটবেলায় দেখেছি পাঞ্জাবীদের ঘোড়ায় চড়া! এখনও মনে পড়ে, সেই পাগড়ী উড়ছে, পার্‌পেণ্ডিকুলার থেকে ঈষৎ সাম্‌নে ঝুঁকে। সওয়ারের কেমন সহজ আর 'খাতির-নাদারৎ' ভাব—দাড়িও উড়ছে সেই সঙ্গে! যেন দুনিয়ার কোন কিচ্ছুর কেয়ার্‌ নেই! সব পথিককে শশব্যস্ত করে সহরের বুকের ওপর দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে যাওয়া! পরমুহূর্তে তুমি দেখ্‌বে কেবল ধূলোর ঝড়, আর কিছু দেখতে পাবে না।

হ্যাঁ, ঘোড়ায় আমায় চড়তে হবেই। ঠিক তেম্‌নি করেই। তা না হলে বেঁচে থেকে লাভ নেই, মোটা হয়ে তো নেই-ই।

আশ্চর্য যোগাযোগ! ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌সনের পর বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি, সদর রাস্তায় নীলামে ডেকে ঘোড়া বিক্রী হচ্ছে। বেশ নাদুস-নুদুস্‌ কালোকোলো একটি ঘোড়া—পছন্দ ক'রে সহচর করবার মতই।

"বাইশ টাকা! বাইশ টাকায় যাচ্ছে—এক, দুই—" "তেইশ!" রুদ্ধ-নিশ্বাসে আমি হাঁকি।

"চব্বিশ টাকা আট আনা!" ভীড়ের ভেতব থেকে একজন যেন আমার কথারই জবাব দেয়।

"চব্বিশ টাকা আট আনা!" নীলামওয়ালা ডাক্‌তে থাকে, "ঘোড়া, জিন, লাগাম, মায় চাবুক্‌—সব সমেত মাত্র সাড়ে চব্বিশে যাচ্ছে! গেল—গেল—এক দুই—"

বলে ফেলি একেবারে—"সাতাশ!"

"আটাশ!" ভীড়ের ভেতর থেকে আবার কোন্‌ হতভাগার বাধা।

আমার পাশের একজন লোক আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়—"আমি ঘোড়া চিনি," সে বলে, "অদ্ভুত ঘোড়া মশাই! এত সস্তায় যাচ্ছে, আশ্চর্য! ওর জিনের দামই আটাশ টাকা।"

"বলেন কি!" আমার চোখ বড় হয়ে ওঠে, "তা হলে আরো উঠতে পারি?"

"নিশ্চয়! ভাব্‌ছেন বুঝি দেশী ঘোড়া? মোটেই তা নয়, আসল ভুটানী টাট্টু!"

ভুটানী টাট্টু বলতে কি বোঝায় তার কোন পরিচয়ই আমার জানা ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গীতে এটা বেশ বুঝ্‌তে পারলাম যে এ-হেন একটা জানোয়ারের মালিক না হতে পার্‌লে জীবনই বৃথা।

অকুতোভয়ে হাঁক দিই—"তেত্রিশ!"

"চৌৎ—" আমার পাশের এক ব্যক্তি ডাকার উদ্যম করে। উৎসাহের সূত্রপাতেই ওকে আমি দমিয়ে দিই - "সাঁইত্রিশ!" তার পর আমি হন্যে হয়ে উঠি—উনচল্লিশ, তেতাল্লিশ, সাতচল্লিশ, উনপঞ্চাশ!"

পর পর এতগুলো ডাক আমি একাই ডেকে যাই। উনপঞ্চাশে গিয়ে ক্ষান্ত হই।

উনপঞ্চাশ—উনপঞ্চাশ। এমন খাসা ঘোড়া উনপঞ্চাশে যায়! গেল—চলে গেল! এক—দুই—"

তার পর আর কেউ ডাকে না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিরস্ত হয়ে পড়েছে তখন।

"—এক, দুই, তিন!"

নগদ উনপঞ্চাশ টাকা গুণে দিয়ে ঘোড়া দখল ক'রে পুলকিত চিত্তে 'বাড়ী ফিরি। সেই পার্শ্ববর্তী অশ্ব-সমঝ্‌দার ভদ্রলোক আমার

এক উপকার করেন। একটা ভাড়াটে আস্তাবলে ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা ক'রে দেন। তারাই ঘোড়ার খোরপোষের, সেবা-শুশ্রূষার যাবতীয় ভার নেবে; সময়ে-অসময়ে এক চড়া ছাড়া আর কোন হাঙ্গামাই আমাকে পোহাতে হবে না। অবশ্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে ওদের।

ভদ্রলোককে সন্দেশের দোকানে নেমন্তন্ন ক'রে ফেলি তক্ষুণি তক্ষুণি।

পরের দিন প্রাতঃকালে আমার অশ্বারোহণের পালা। ভাড়াটে সহিসরা ঘোড়াটাকে নিয়ে আসে। জনকতক ধরেছে ওর মুখের দিকে, আর জনকতক ওর লেজের দিকে। মুখের দিকের যারা, তারা লাগাম, ঘোড়ার কান, ঘাড়ের চুল অনেক কিছুর সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু লেজের দিকে লেজটাই একমাত্র সম্বল! ও ছাড়া আর ধর্তব্য কিছু নেই। আমি বিস্মিতই হই কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করি না, পাছে আনাড়ী ভাবে। ঘোড়া আনার ঐ নিয়ম হয়তো, কে জানে!

সেই ডাক্তার ভদ্রলোক বাড়ীর সামনে দিয়ে সেই সময়ে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে থামেন। "এই যে! একটা ঘোড়া বাগিয়েছ দেখ্‌ছি! বেশ বেশ! কিন্‌লে বুঝি? কতয়? ঊনপঞ্চাশে? বাঃ, সস্তাই তো! দিব্যি ঘোড়া! খাসা! বাঃ!"

ঘোড়ার পিঠ চাপ্‌ড়ে নিজের প্রেসক্রপ্‌সন্‌কেই রেকমেণ্ড্‌ করেন— হ্যাঁ, হাঁটা ছাড়। হাঁ-টা ছাড়। হ্াঁটা ব্যায়াম নাকি আবার। মানুষে হাঁটে? ঘোড়ায় চড়্‌তে শেখো। অমন ব্যায়াম আছে আর? দু'দিনে চেহারা ফিরে যাবে। এত কাহিল হয়ে পড়্‌বে যে তোমার মামারাই তোমাকে চিন্‌তে পারবেন না। হুঁম্‌।"

তাঁর 'রুগী' দেখার তাগাদা, অপেক্ষা করার অবসর নেই। ঘাড় নেড়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েই তিনি চলে যান। দর্শকের মধ্যে তাঁকে

গণনা না করেই আমার অভিনব ব্যায়াম-পর্ব শুরু হোলো।

সহিসরা বেশ ক'ষে তাকে ধ'রে থাকে, আমি একটা টুলের সাহায্যে আস্তে আস্তে আস্তে তার পিঠের উপর উঠে বসি। বেশ যুত্‌ করেই বসি ; শ্রীযুত হয়ে।

কিন্তু যেমনি না তাদের ছেড়ে দেওয়া, ঘোড়াটা চারটে পা একসঙ্গে জড় করে, পিঠটা দুমড়ে ব্যাখারীর মত বেঁকিয়ে আনে। এবং হঠাৎ করে কি, পিঠটা একটু নামিয়েই না, ওপরের দিকে এক দারুণ ঝাড়া দেয়—ধনুকে টঙ্কার দেওয়া যেন! সেই এক ঝাড়াতেই আমি একেবারে স্বর্গে—ঘোড়ার পিঠ ছাড়িয়ে প্রায় চার পাঁচ হাত উঁচুতে আকাশের বায়ুস্তরে বিরাজমান!

শূন্যমার্গে চলাচল আমার মত স্থূল জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, অন্ততঃ বেশীক্ষণ তো নয়, সুতরাং আমাকে নাম্‌তে হয়, ঘোড়ার পিঠেই। এবং সেই মুহূর্তেই আবার যথাস্থানে আমি প্রেরিত হই, কিন্তু আবার হয় আমার অধঃপতন! এবার জিনের মাথায়। আবার আকস্মিক উন্নতি! এবার নেমে আসি ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর। আবার আমাকে উপরে ছুঁড়ে দেয় ; এবার যেখানে নামি সেখানে ঘোড়ার চিহ্নমাত্রও নেই। অশ্ববর আর আমার আড়াই হাত পেছনে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন, আমাকে লুফে নেবার জন্যই কি না কে জানে!

ঘোড়ার মতলব মনে মনেই আমি টের পাই, ধর্‌বার আগেই আমি শুয়ে পড়ি। জানোয়ারটা ততক্ষণে আমাকে ফেলে, উন্মুক্ত গৌহাটি-পথ দিয়ে বন্দুকের গুলির মত ছুটে চলেছে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি, ঘোড়ায় চড়ার বিলাসিতা পোষাল না আমার। একটা হাত কপালে রাখি, আর একটা তলপেটে। মানুষের হাতের সংখ্যা যে প্রয়োজনের

পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, একথা এর আগে এমন ক'রে আমার ধারণাই হয় নি। কারণ তখনও আরো কয়েকটা হাতের বিলক্ষণ অভাব অনুভব করি। ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে, পাঁজরায় এবং শরীরের আরো নানা স্থানে হাত বুলোবার দরকার বোধ করছিলাম।

কেবল যে বেহাতই হয়েছি তাই নয়, বিপদ্ আরো ;—উঠ্‌তে গিয়েই সেটা টের পাই। দাঁড়াবার এবং দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে দুটো পাও মোটেই যথেষ্ট নয় তখন বুঝি। সহিসরা ধরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেয়, কিন্তু যেম্‌নি না ছাড়ে অম্‌নি আমি সটান্! তখন সবাই মিলে, সহানুভূতি ভরে ধরাধরি ক'রে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়। বলা বাহুল্য, এ-ব্যাপারেও আমার নিজের হাত-পা নিজের কোনই কাজে লাগে না, এক ওদের হ্যাণ্ডেল্ হওয়া ছাড়া।

তার পর প্রায় একমাস আমি শয্যাগত। সবাই বলে ডাক্তার দেখাতে, কিন্তু ডাক্তার ডাকার সাহস হয় না আমার। আমার মামার বন্ধু—তিনিই তো? এই অবস্থাতেই আবার ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা দিয়ে বস্‌বেন কিনা কে জানে! অশ্ব-চিকিৎসা ছাড়া আর কিছু তো তাঁর জানা নেই! সেই পলাতক ভুটানী টাট্টুকে যদি খুঁজে নাও আর পাওয়া যায়, একটা নেপালী গাঁট্টা যোগাড় ক'রে আন্‌তে কতক্ষণ? ডাক্তার—? নাঃ! মাতৃ-পুরুষ-ক্রমে ও আমাদের ধাতে সয় না।

বিছানা ছেড়ে যেদিন প্রথম বেরুতে পারলাম সেদিন হোটেলের বড় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চম্‌কে যেতে হয়। য়্যাঁ! এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি? দেখে নিজেকে চেনাই যায় না যে! মুখের দিকে তাকাতেই ইচ্ছা করে না,—বিকৃতবদনে বাইরে বেরিয়ে আসি।

রাস্তায় পা দিয়েই আস্তাবলের বড় সহিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ। "হুজুর, আপনার কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে।"

"পাওনা?" দ্বিতীয়বার আমাকে চমকাতে হয়—"পাওনা কিসের?"

"আজ্ঞে, সেই ঘোড়ার দরুণ।"

"কেন, তার দাম তো চুকিয়ে দিয়েছি। উনপঞ্চাশ টাকা আর চাবুকের দরুণ ক'-আনা? হ্যাঁ, চাবুকের দামটা পাবে বটে তোমরা! তা, চাবুক তো আমার কাজে লাগে নি, ব্যবহারই করতে হয় নি আমার। ও ক' আনাও কি দিতেই হবে?"

"আজ্ঞে কেবল ক'-আনা নয় তো, বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা মোট। এই দেখুন বিল।"

"বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা?" আমার চোখ কপালে ওঠে। "কেন, আমার অপরাধ?"

"আজ্ঞে আপনার ঘোড়ায় খেয়েছে এই এক মাসে সাড়ে বাইশ টাকার ছোলা, সওয়া পাঁচ টাকার ঘাস—"

আমি বাধা দিয়ে বলি—"কেন সে তো পালিয়ে গেছে!"

"আপনার ঘোড়া? মোটেই না। খাবার সময়েই ফিরে এসেছিল আর তার পর থেকে ঠিক রয়েছে। সেই ছোট সহিসকে হুকুম দেয়—'নিয়ে আয় তো ভুটানী টাট্টুকে হুজুরের সামনে।"

বলতে বলতে সহিসটা ঘোড়াকে এনে হাজির করে। ঘোড়াটা যে ভাল খেয়েছে-দেয়েছে তাতে ভুল নেই, বেশ একটু মোটাসোটাই ব'লে আমার মনে হ'ল।

"আমরা তো তবু ওকে কম খেতে দিয়েছি, দিতে পারলে ওর ডবল, চারগুণ, আটগুণ খেতে পারত। কিন্তু সাহস ক'রে খাওয়াতে পারি নি আমরা, আপনি বেঁচে উঠবেন কিনা ঠিক ছিল না তো! এর আগে—" সহিসটা হঠাৎ থেমে যায়, আর কিছু বল্‌তে চায় না।

কথাটা খোলসা করার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করি। ছোট

সহিসটা সাহস করে বলে—"ওতে চেপে এর আগে আর কেউ বাঁচে নি।"

বড় সহিসটা জানায়—"এই তো ঘাস আর ছোলাতেই গেল সওয়া পাঁচ আর সাড়ে বাইশ। একুনে সাতাশ টাকা বারো আনা। ভুট্টা খেয়েছে দশ টাকার। ভুটানী টাট্টু কিনা, ভুট্টা ছাড়া ওদের চলে না। এই গেল সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা—"

"বিল্ এনেছ, আমার খাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।" মনে মনে বলি।

এবার ছোট সহিসটা সুরু করে—"তার পর ঘোড়ার বাড়ীভাড়া বাবদে গেল দশ টাকা—"

"ঘোড়ার জন্যে একটা বাড়ী?" আমি অবাক্ হ'য়ে যাই।

"আজ্ঞে একটা গোটা বাড়ী কি দশ টাকায় পাওয়া যায় কখনও? আর গোটা বাড়ী নিয়ে একটা ঘোড়া করবেই বা কি? ওদের তো খাবার ঘর কি শোবার ঘর, বৈঠকখানা কি পায়খানা আলাদা আলাদা লাগে না। এক জায়গাতেই ওদের সব কাজ—কিন্তু হুজুর, ঐ জায়গাটুকুর ভাড়াই হচ্ছে দশ টাকা।"

আমার কথা বেরোয় না। সহিসটা সুর মোলায়েম করে—"তার পর হুজুরের ঘোড়ার খিদ্মৎ খেটেছি, আমাদের মজুরি আছে। আমরাই কি দশ পনর টাকা না আশা করি হুজুরের কাছে?"

হুজুরের অবস্থা তখন মজুরের চেয়েও কাহিল। তবু মনে মনে হিসাব ক'রে অঙ্ক খাড়া করি—"তা হ'লেও সব মিলিয়ে বাষট্টি টাকা বারো আনা হয়। আর দশ টাকা দু' পয়সা কিসের?"

ছোট সহিসটা বেশ চট্পটে—"আজ্ঞে ও দু' পয়সা আমাকে দিবেন। খৈনির জন্যে।"

"ঘোড়ায় খৈনি খায়? আশ্চর্য।"

"আজ্ঞে ঘোড়ায় খায়নি। আমিই খাবার জন্য ডল্‌ছিলাম,

ঘোড়ার নাকের কাছেই। কিন্তু যেম্‌নি না ফট্‌ফটিয়েছি অম্‌নি হারামীটা হেঁচে দিয়েছে—সমস্ত খৈনিটাই বর্‌বাদ।”

তখনই পকেট থেকে পয়সা ছুটো বের ক'রে ওকে দিয়ে দিই। যতটা পাৎলা হওয়া যায়! দেনা আর শত্রু কখনও বাড়াতে নেই।

বড় সহিস বলে—“আর বাকী দশ টাকার হিসাব? জানোয়ার এমন পাজী আর বলব কি হুজুর! একদিন আমার পাকিটের মধ্যে নাক সেঁধিয়ে একখানা দশ টাকার নোট্‌ বেমালুম মেরে দিয়েছে। একদম হজম্‌!”

“য়্যাঁ, বল কি?” আমি বিচলিত হই—“একেবারে খেয়ে ফেল্‌ল নোট্‌খানা? দশ-দশটা টাকা?”

“এক্কেবারে। আমরা আশা কর্‌লাম পরে পাওয়া যাবে। ওর মালমশলার সঙ্গে বেরুবে। মনে করে ভরপেট দানাপানি খাওয়ালাম ওকে। কিন্তু নাঃ, পরে অনেক আস্ত ছোলা পেলাম, সেগুলো ঘুগ্‌নি-ওয়ালাদের দিয়েছি, কিন্তু নোট গায়েব। এ-টাকাটাও ঘোড়ার খোরাকীর মধ্যেই ধ'রে নেবেন হুজুর।”

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। এ রকম অবস্থায় একটা হাতই অপর্যাপ্ত, আর একটার সহযোগিতা না হলেও চলে।

সহিসটা আশ্বাস দেয়—“চাবুকের দামটা তো ধরা হয় নি হুজুর, যদি মর্‌জি করেন তা হ'লে ওটার কয় আনা জুড়ে পূরো তেয়াত্তর টাকাই দিয়ে দিবেন। আর আমাদের ছ'জনকেই ছুটো টাকা, বিনয়ের বাড়াবাড়িতে জড়ীভূত হয়ে পড়ে সে—“আপনাদের মত আমীর লোকের কাছেই তো আমাদের বক্‌শিশের আশা হুজুর!”

প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে সহিস-বিদায় করি। মামার দেওয়া যা উপ-সংহার থাকে তার থেকে হোটেলের দেনা চুকিয়ে, হয়তো মালগাড়ীতে বামাল হয়ে বাড়ী ফির্‌তে হবে। যাই হোক, ঘোড়াকে আর আস্তা-

বলে ফিরিয়ে নিতে দিই না। সাম্‌নেই একটা খুঁটোয় বেঁধে রাখতে বলি, রাস্তাই আমার ঘোড়ার আস্তাবল এখন থেকে। সেই উপকারী ভদ্রলোককে ডেকে দিতে বলি সহিসদের যিনি কেবল ঘোড়া চিনিয়ে নিরস্ত হন্ নি, আস্তাবলও দেখিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোককেই ঘোড়াটা উপহার দিয়ে তাঁর উপকারের ঋণ শোধ কর্‌ব।

অভিলাষ প্রকাশ করতেই বড় সহিসটা বলে—"ওঁকে আর কি দেবেন হুজুর! ওঁর ভগ্নীপতিরই তো ঘোড়া!"

আমার দম ফেল্‌তে দেরী হয়। সেই নীলামওয়ালা ওর ভগ্নীপতি? সেই ধাক্কা সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতেই ছোটটা যোগ করে— "আর ওঁরই তো আস্তাবল!"

আমি আর কিছু বলি না, কেবল এই সংকল্প স্থির করি, যদি আমি গৌহাটিতে থাক্‌তে থাক্‌তেই সেই উপকারী ভদ্রলোকটি মারা যান্, তা হলে আমার যাবতীয় কাজকর্ম—গল্পের বই পড়া, বায়স্কোপ দেখা এবং আর যা কিছু সব স্থগিত রেখে ওঁর শবযাত্রায় সবার আগে সাগ্রহে যোগ দেব। সব আমোদপ্রমোদ ফেলে প্রথমে ঐ কাজ।

সহিসরা চলে যায়। আমি ঘোড়ার দিকে তাকাই আর মাথা ঘামাই—কি গতি কর্‌ব ওর? কিংবা ওই আমার কি গতি করে? এমন সময়ে ডাক্তারের আবির্ভাব হয় সেই পথে। আমাকে দেখে এক গাল হাসি নিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন—"এই যে! বেশ জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে এসেছ। দেখলে তো এক মাসেই? তখনই বলেছিলাম! ঘোড়ায় চড়ার মত ব্যায়াম আছে আর? পায়ে হেঁটে কি এত হালকা হতে পারতে? আরও মুটিয়ে যেতে বরং! যাক, খুসী হলাম তোমার চেহারা দেখে। বাড়ী ফিরে মামাকে ব'লো মোটা রকম ভিজিট্ পাঠিয়ে দিতে।"

"মামা কেন, আমিই দিয়ে যাচ্ছি।" আমি সবিনয়ে বলি, "যদি

আপনি দয়া করে নেন, আস্ত এই ঘোড়াটাই আপনার ভিজিট।"

"খুসী হলাম, আরো খুসী হলাম!" ডাক্তার বাবু সত্যিই পুলকিত হয়ে ওঠেন, "তা হলে এবার থেকে আমার রুগী দেখার কাজও হবে, ব্যায়াম করাও হবে। বেশ বেশ! এখুনি আমার একটা কল্ আছে, তু মাইল দূরে রুগী দেখার। ভালোই হ'ল?"

ডাক্তার বাবু লাফিয়ে চাপেন ঘোড়ার পিঠে; ওঠার কায়দা দেখেই বুঝতে পারি এক কালে ওই বদ্অভ্যাস রীতিমতই ছিল ওঁর। পর মুহূর্ত্তেই তাঁকে আর দেখতে পাই না। দেখ্তে পাই বিকালে! হোটেলের সাম্নেই আস্তে আস্তে পায়চারি করছি, দেখি, তিনি মুহ্যমানের মত ফিরছেন! সটান হেঁটেই।

"আপনার ঘোড়া কি হ'ল?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি। আমার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেন "এই হেঁটেই ফির্লাম! কতটুকুই বা পথ! তু মাইল তো! ঘোড়ায় চড়া ভালো ব্যায়াম বটে কিন্তু বেশী ব্যায়াম কি ভালো? অতিরিক্ত ব্যায়ামে অপকারই করে। মাঝে মাঝে হাঁটতেও হয়।"

তিনি আর দাঁড়ান না।

খানিক বাদে ডাক্তার বাবুর চাকর এসে বলে—"গিন্নীমা আপনার ঘোড়াকে ফিরিয়ে দিলেন।"

"কিন্তু ঘোড়া কই? ঘোড়াকে তোমার সঙ্গে দেখ্ছি না তো!"

ঘোড়া যে কোথায় তা চাকর জানে না, ডাক্তার বাবুও জানেন না, তবে তাঁর কাছ থেকে যা জানা গেছে তাই জেনেই কর্তার অজ্ঞাতসারেই গিন্নী এই মোটা ভিজিট্ প্রত্যর্পণ কর্তে বিলম্ব করা সমীচীন মনে করেননি। কর্ত্তৃ-বাচ্যের কাছ থেকে গিন্নী যা জেনেছেন তা আমি কর্মবাচ্যের কাছ থেকে জান্বার চেষ্টা করি। যা পঙ্কোদ্ধার হয় সংক্ষেপে তা এই,—অশ্বপৃষ্ঠে যত সহজে ডাক্তার

বাবু উঠতে পেরেছিলেন নামাটা তাঁর তত সহজসাধ্য হয় নি, যথাস্থানে তো নয়ই। দু মাইলের কথাই না, পাক্কা পনর মাইল গিয়ে ঘোড়াটা তাঁকে নামিয়ে দিয়েছে। নামিয়ে দিয়েছে বল্লেও ভুল বলা হয়, ভূমিসাৎ ক'রে পালিয়েছে। কোথায় গেছে বলা কঠিন, এতক্ষণে একশ' মাইল, দেড়শ' মাইল, কি হাজার মাইল চলে যাওয়াও অসম্ভব না। কর্তা বলেন একশ', গিন্নীর মতে দেড়শ', আর এক হাজার হচ্ছে চাকরের নিজের ধারণা।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি,—তক্ষুনি গাড়ী ধরে বাড়ী ফেরার জন্য। খাবার সময় তো প্রায় হয়ে এল, যে এক হাজার মাইল সে এক নিঃশ্বাসে গেছে, ক্ষিদের ঝোঁকে তা পেরিয়ে আস্‌তে তার কতক্ষণ? আধ নিঃশ্বাসও লাগবে না হয়তো। ঘাড় থেকে ঘোড়া না নামিয়ে গৌহাটিতে বাস করা বিপজ্জনক।

পুরুষস্য ভাগ্যম্।

"তুমি কি হারমোনিয়ম কিন্‌বে দাদা?" বিনি এসে জিগ্যেস করে আমায়।

"হারমোনিয়ম? হারমোনিয়ম কেন?" আমি অবাক হয়ে যাই। "য়্যাতো জিনিষ থাক্‌তে হারমোনিয়ম যে হঠাৎ?"

"কেন, হারমোনিয়ম কি কেনে না মানুষ? বিনি কিন্তু-কিন্তু হয়: "কিন্‌তে নেইকি কখনো? কিন্‌লে কি হয়?"

"কেন কিন্‌তে যাব শুনি?" আমি আরো অবাক্ হই: "আমি যদি ও জিনিষ বাজাতে জানতুম্—তাহলেও নাহয় কথা ছিল!"

"হঁ্যা, তুমি আবার বাজাতে জানো না! কেন, এই তো সেদিন আইভিদির ওখানে বাজালে! বেশ ভালোই বাজালে তো! চমৎকার তো!" বিনি একটু ঢোঁক্ গিলে বলে: "এমন মন্দ কি—খারাপ কি এমন?"

বিনির উচ্চপ্রশংসায় আমি ভড়্‌কাই না—ওর ফাঁদে পা দিই নে সহজে।

অবিশ্যি বাজাতে যে একেবারে জানিনে তা নয়! কিন্তু মুস্কিল এই, বাজাতে গেলে আমার বেলো করা হয় না। বাজাতেই দুটো হাত লেগে যায়। ভালো করে, বাজাতে হলে এক হাতে চলে না! চলে কি? তোমরাই বলো? তারপর ধরো, বেলো করা—সেই কি এক কম হাঙ্গাম্? এক হাতের কর্মই নয় বল্‌তে গেলে! কাজেই বাজাতে গেলে আমার বেলো করা হয় না, আর বেলো করতে গেলে বাজাই কখন? হারমোনিয়ম বাজাতে চার্‌টে হাত এখন পাই কোথায়?

বিনিকে আমার সমস্যাটা বলি, খুলেই বলি।

বিনি গম্ভীরভাবে খানিক ভেবে নেয়: "তা বটে! তবে এক কাজ কর্‌লে তো হয় দাদা! আমরা দুজনে মিলে বাজালেই পারি। আমি বেলো কর্‌ব তুমি বাজাবে, তারপর তুমি বেলো কর্‌বে আর আমি—

"হ্যাঁ, তাহলে একরকম হয় বটে! তুই বেলো করবি আমি বাজাব তারপর আমি বাজাবো তুই বেলো কর্‌বি। হ্যাঁ, এরকম কর্‌লে হয় বটে। মন্দ হয় না খুব। দুজনের মিলিয়ে চারটেই তো হাত আমাদের, তাতেই বা সন্দেহ কি?"

"তাহলে হারামানিয়ম বাজাতে আর আপত্তি কি তোমার?"

"না, আপত্তি আর কি! তবে কি না, সুর টুর তো আমি ভালো বুঝিনে। ও হচ্ছে তোদের এলাকা। গানের ব্যাপারে তোর কাছে আমি একটা শিশু, অম্লানবদনেই একথা আমি স্বাকার করবো। ও বিষয়ে তুই একটা হাতীর সমকক্ষ।"

"হাতী?" বিনির দম যেন আট্‌কে আসে: "হাতী আমি?"

"আমি কি দেহের তুলনা করেছি?" ওকে আশ্বস্ত কর্‌তে হয়: "আহাহা! সে কথা নয়। তা কেন হতে যাবে? না না।—হাতীর চেয়ে তুই ঢের পাত্‌লা! আমি তোদের সুরের কথাটাই বল্‌ছি কেবল। তোরও সুর নাক দিয়ে বেরোয় আর হাতীরও প্রায় তাই। এমন কি হাতীর নাকটাই একটা সুর বলতে গেলে।"

"একেবারেই না।" বিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করে: "সুর আর শুঁড় তুমি গুলিয়ে এক করে' ফেলেছে। বানানের কোনো জ্ঞান নেই তোমার। কি করে' যে লেখো!"—বিনি ঠোঁট উল্‌টায়: "উনি আবার লেখক!"

নিজের নাকেও একবার হাত দিয়ে ছাখে অজ্ঞাতসারে।

"লেখক না পিণ্ডি!" নিঃসন্দিগ্ধ হয়েই এবার সে ঘোষণা করে' ছায়।

"কেন বানানের কি ভুলটা হোলো শুনি?" আমিও ঈষদুষ্ণ হই: "গলা দিয়ে বেরোলেই স্বর, আর নাক দিয়ে বেরুলেই স্যুর, সবাই জানে একথা। স্যুর মানেই তো নাকি স্যুর, কে না জানে! তা বড় বড় গাইয়েই কি আর তুমিই কি—আর আসল জানোয়ার আস্ত একটা হাতীই বা কি—তোমাদের সবার ঐ একই স্যুর বাপু! একমাত্র ঐ নাকি স্যুর! কেন, 'স্যুর'—এই সামান্য কথাটাই নাক দিয়ে বার্ করে ছ্যাখ্ না! শুঁড় হয়ে বেরুবে—হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—বেরোয় কিনা পরীক্ষা করে' ছ্যাখ্!"

বিনি এবার একটু থতমত খায়: "কে তোমায় শুঁড় নাড়তে বল্‌ছে শুনি? হারমোনিয়ম কিন্‌বে কিনা তাই বলো! নাই বা গাইলে, কিনে চুপ চাপ্ বাজালেই পারো।"

"তা বটে। বাজালে বাজানো যায় বটে!" আমি ঘাড় নাড়ি। "বাজ্‌নাটা আমি না জানি যে তাও না। এমন কিছু শক্তও নয় বাজানো। সাদা আর কালো ঘরগুলোয় এলোপাতাড়ি ঝপাঝপ্ আঙ্গুল ফেলে ফেলে চলে' যেতে হয় কেবল! একদম্ একটুও না থেমে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও না! মোটেই থামা চল্‌বে না, বেদম্ হয়ে বাজাতে হবে, জানি তা—তবে কিনা—"

বল্‌তে গিয়ে স্থগিত হয়ে পড়ি। বলব কিনা ভাবি।

"আবার তবে কিনা—কি?" বিনি এবার বিরক্তই হয়।

"তবে কিনা—বলেইছি তো!—বেলো করাটাই কষ্টকর। আর বোধ হয়—বোধ হয় ঐ শোনাটাও—তুই কি বলিস্?—শোনাটাও কম কষ্টকর নয়?" আমি না বলে' আর পারি না: "হারমোনিয়ম কিন্‌তে আর কিঁ, বাজাতেও কিছু না, কেবল ওর আওয়াজ্‌টাই আমার খুব

খারাপ লাগে। বলতে কি, ওই জন্যেই আমি জোয়ারদারের বাড়ী যাই নে। ও-বাড়ীর ধার দিয়ে, ওই রাস্তা দিয়েই ঘেঁষিনে। ওর বাড়ী গেলেই এমন হারমোনিয়ম বাজাতে আরম্ভ করে যে—না, ভারি বিচ্ছিরি ওর বদভ্যাস। হারমোনিয়মটাও ওর বিচ্ছিরি।"

গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে' ফেলি অবশেষে।

"আহা, জোয়ারদার মশাইয়ের হারমোনিয়মের কথাই তো বল্‌ছি আমি।" বিনি বলে' ওঠে : "বেচে ফেল্‌চেন উনি!"

"ফেলুন্ গে। বেচে ফেল্‌লে বাঁচা যায়।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বলি। "এক্ষুনি বেচুন গে।"

"তুমি হয়ত কিন্‌তে পারো আমি ভাব্‌ছিলাম। তোমার যেরকম সঙ্গীত-পিপাসা! বাজ্‌নার দিকে যেরকম ঝোঁক্ তোমার।" বিনি আবার আমাকে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করে : "সেদিন আইভিদির পার্টিতে দেখ্‌লুম কিনা! ভালোই তো বাজিয়েছিলে। তোমার বাজ্‌নার চোটে গাইয়ে পর্যন্ত থ হয়ে গেল! থেমে গেল ভড়্‌কে গিয়ে। সাম্‌নের দোকানের লাউড্ স্পীকার্ লাগানো রেডিয়োও কেউ কানে তুল্‌তে পারলনা।"

"তা একটু ভালোই বাজিয়েছিলাম বোধহয়! সবাই খুব খুসী হয়েছিল, না রে? বাজ্‌নাটা আমার বেশ আসে।" মনে মনে গর্ব হয়, কিন্তু সহজে আত্মহারা হই না : "কিন্তু যাই বল্ হারমোনিয়মে আমাদের কাজ নেই। ও ভারী হাঙ্গাম্, ওর আওয়াজ শুনলে লেখা-টেখা মাথায় উঠে যাবে আমার।"

"তুমি ভারী একগুঁয়ে দাদা!" বিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে চলে যায়, বলে' যায় যেতে যেতে : "লিখে তো সব হয়! ভারী উনি লেখক! লেখক না হাতী। লিখে তো কাঁচকলা পান্! ভালো কথাই বল্‌ছিলাম, বাজিয়ে হাত পাক্‌লে, ভালো বাজিয়ে হতে পারলে তু

পয়সা পেতেন তবু। অন্ততঃ বিখ্যাত হতে পারতেন! নামটা জান্‌ত সবাই।"

বিনির খেদোক্তিতে বিচলিত হয়ে আমিও বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি বিনির দাদূনিন্দা আমার ভালো লাগে না! আমার মনে আঘাত লাগে। সত্যি বলতে কি, আমাদেরও, এই লেখকদেরও, মন বলে' একটা কিছু আছে,—থাকা অসম্ভব নয়। মনের সেই চর্মস্থলে গিয়ে, বিনির কথাগুলো জুতোর পেরেকের মতো খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। এত খচ্‌খচানি আমার সহ্য হয় না। নাঃ; এ হেন বোনের সান্নিধ্যে বাস করা বনবাসেরই নামান্তর।

কী ভেবেছে আমায় ও? নামের জন্যে আমি যেন হাপিত্যেশ হয়ে বসে আছি। নাম কেন্‌বার খাতিরে গলায় দড়ি দিতেও রাজি হয়ে যাবো? বা-রে! আহ্লাদ আর কি! আমার বাজিয়ে হয়েও কাজ নেই, অমন নাম বাজিয়েও কাজ নেই আমার। জোয়ারদারের ওই বীভৎস হারমোনিয়ম আমি তা বলে' গলায় ঝোলাতে পার্‌ব না। নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবো না কি? ছুর্‌ ছুর্‌!!

কিন্তু, রাস্তায় বেরিয়েই কি নিস্তার আছে? পাড়ার যেখানেই যাই, যার কাছেই গিয়ে কান পাতি, শুধু ওই হারমোনিয়ম আর হারমোনিয়ম! কাউকে জানাতে আর বাকী রাখেনি জোয়ারদার। সবার মুখেই কেবল ঐ এক কথা।—ভালো একটা হারমোনিয়ম বিক্রি রয়েছে। বেচে দিচ্ছেন আমাদের জোয়ারদার মশাই—কিন্‌বে কেউ?

এমন কি, আমাদের ঘোষাল তো একজন হারমোনিয়মওলার কাছে গিয়েই কথাটা পেড়েছে। জোয়ারদার মিনিমাম্‌ দাম চান্‌ চল্লিশ—কিন্তু কোনো হারমোনিয়মওলা যদি কেনে তাহলে তিনি তিরিশে 'নাব্‌তেও রাজি আছেন। কেননা, সে-বেচারীকেও তো

আবার বেচ্‌তে হবে জিনিসটা, দাম বাড়িয়েই বেচ্‌তে হবে আবার। মারামারি করেই তো বেচ্‌তে হবে!

ঘোষাল জিগ্যেস্‌ করেছে: "বলেন তো আরো নাবাতে পারি জোয়ারদারকে। ধরে বেঁধে নামানো যায় না যে তা নয়। আরো নাবাবো?"—ভারিক্কি চালে ঘোষাল ভ্রূ-কুঞ্চিত করেছে: "এই ধরুন্‌, মিনিমাম্‌ কুড়ি টাকায়?—"

হারমোনিয়মওলা ঘোরতর ঘাড় নেড়েছে: "মিনি মাগ্‌নায় দিলেও না। এমন কি মুটে ভাড়া বলে' যদি এক মুঠো টাকা আমার হাতে গুঁজে দেওয়া হয় তবু নেব না। কিছুতেই না।"

এরকম ঘোষণার পর, ঘোষালকে,—না, ঘোষালের আর কী দোষ? —তবে বেশ একটু ভ্যাবাচাকাই খেতে হয়েছে বেচারাকে।

এদিকে, চার ঘণ্টার মধ্যেই, জোয়ারদার মশাই চল্লিশ থেকে চার টাকায় নেমে এসেছেন। নিজে থেকেই অযাচিত ভাবে নেবেছেন। একেবারে তর্‌ তর্‌ বেগেই—কী ভরসায় কে জানে! বোধ হয় যেভাবে মানুষের নাড়ী ছাড়ে, সেই ভাবেই হারমোনিয়মটাকে তিনি ছাড়াতে চান। অথবা, বিখ্যাত সিন্ধুবাদ যে করে' কাঁধ থেকে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বুড়োকে নামিয়ে ঘাড় খালি করেছিল সেইরকম করেই ওটাকে তাড়িয়ে তিনি ঘর খালি কর্‌তে উদ্যত।

কিন্তু তথাপি, বিস্ময়ের বিষয় একটিও খদ্দের আসেনি এখনো।

আমিও একটু আশ্চর্যই হচ্ছি—ক্রমশই। বাস্তবিক্‌, এত সস্তায়, বল্‌তে গেলে, অম্‌নিতেই চলে যাচ্ছে একটা জিনিষ—জিনিষের মতো জিনিষ—অথচ নেবার কারু পাত্তা নেই? এরকম ক্ষেত্রে খবর পাবা মাত্রই তো মানুষদের লাফাতে লাফাতে চলে আসা উচিত? অন্ততঃ, মড়া ফেল্‌তে যারা জোটে, অযাচিত ভাবেই জুটে যায়, গায়ে পড়েই ঘাড় পেতে ছ্যায়, তারাই বা এসে জুটছে না কেন?

ব্যাপার কি, সঠিক জান্‌তে জোয়ারদারের বাড়ী গিয়ে হাজির হই।

দেখি, বিস্তর লোক সেখানে জড়ো। জোয়ারদারমশাই কাগজ কুঁচিয়ে, রবার্ ষ্ট্যাম্প্ দেগে, শ'খানেক লটারীর টিকিট্ বানিয়ে ফেলেচেন। এক এক টাকা দামের প্রত্যেকটা। এক এক জনকে ধরে' ধরে' গছিয়ে দিচ্ছেন এক একখানা। আট আনা হাত্‌ড়ে পেলেও ছাড়চেন না, ধার বাকিতেও দিয়ে দিচ্ছেন। আমাকেও একটা কিন্‌তে বল্লেন।

রেঞ্জার্স্, আইরিশ সুইপের, বহুৎ টিকিট্ আমি কিনেছি, কক্ষণো কিছু পাইনি। লটারী জেতা আমার ভাগ্যে নেই। অতএব—হ্যাঁ, এ-টিকিট্ আমি একটা কিন্‌তে পারি বটে। নির্ভয়েই পারি। দু' এক টাকার ওপর দিয়েই যদি পাপ বিদেয় হয়, ঝক্কি নেমে যায়, মন্দ কি?

আমি দুখানা টিকিট কিনি, একখানা নিজের নামে, আরেকখানা—না, বিনি নয়,—জোয়ারদারের নামেই কিনে ফেলি।

জোয়ারদার কিন্তু ভীষণ আপত্তি করেন: "না-না! আমাকে আবার জড়ানো কেন? আমি কেন আবার?"

"ভয় কি? আপনিও তো পেয়ে যেতে পারেন।" আমি ভরসা দিই: "ফের পেতে পারেন আবার। পুরুষের ভাগ্যে কখন কী আছে কে বলতে পারে?"

"আমার দরকার নেই।" অপ্রসন্ন মুখে জবাব দ্যান্ জোয়ারদার: "তবে নেহাতই যদি ফের এসে জোটে, আবার ফিরে পাই, এটাকে তাহলে আমি লেটার্ বক্‌স্ বানিয়ে ফেল্‌ব।"

"আমি কি করব জানিনে। তবে আমি নিশ্চিন্তই আছি।" জানাই আমি: "আমার বরাতে জুট্‌বে না। আমার তেমন বরাত নেই।"

কিন্তু আমার বরাতেই জুটে গেল!

যে-আমি জীবনে কদাপি, রেঞ্জার্স্ কি আইরিশ সুইপ্ সুদূরে

থাক্‌, সামান্য একটা গির্জা-বাড়ীর চ্যারিটির চার আনার টিকিটের পাঁচ টাকার লাস্‌ট্‌ প্রাইজও পাইনি কখনো, সেই আমিই কিনা, নিজের পাড়ার লটারাতে, প্রথম ধাক্কাতেই, এক মিনিটের মধ্যেই, এক হারমোনিয়ম লাভ করে' বস্‌লাম। প্রাইজের সেরা—প্রাইজের সার—সেই হারমোনিয়ম এবং সার্‌প্রাইজ্‌ যুগপৎ লাভ করলাম! ভাগ্যের বিপর্যয় আর বলে কাকে?

যখনই মর্‌তে জোয়ারদারের বাড়ী পা বাড়িয়েছি (যে রাস্তা দিয়ে, প্রাণ গেলেও, সুরাসুরের ভয়ে কদাপি আমি হাঁটিনে) তখনই, আমার ভাগ্য যে বদ্‌লাচ্ছে, ভয়ানক ভাবেই বদ্‌লাতে যাচ্ছে, অচিরেই তা আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু, এই প্রাপ্তি-যোগের, মুহূর্ত্তখানেক আগেও, ঘুণাক্ষরেও এহেন সন্দেহ আমার মনে জাগেনি।

'নিয়তি কেন বাধ্যতে!' নিয়তি কি ভাবে কেন যে বাধ্য করে' ক্যালে টের পাওয়া যাচ্ছে এখন। হাড়ে-হাড়েই টের পাচ্ছি।

ঘাড়ে ঘাড়েও টের পেলাম। জোয়ারদার মশাই হারমোনিয়ম্‌টা কোথায় আর চাপাবেন, চার ধারে তাকিয়ে, সোজা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলে্‌ন। বেশ সহাস্য মুখেই! আমার কেনা ওঁর টিকিটখানাও (বোঝার ওপর শাকের আঁঠি হিসেবে) গছিয়ে দিলেন তার ওপরে।

আমার আকস্মিক সৌভাগ্যোদয়ে সম্ভবত: সকলের ঈর্ষা হতে লাগ্‌ল। চতুর্দিকের ছদ্ম হর্ষধ্বনির মাঝ দিয়ে, সমবেত জনতা ফাঁক করে' মহাসমারোহে ওটাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। বধ্যভূমিতে নিয়ে এলাম। অত্যন্ত ব্যাজার হয়েই বয়ে আন্‌লাম্‌ বলাই বাহুল্য।

যেখানে উনুন্‌ ধরানোর কয়লা-কাঠ ঘুঁটে প্রভৃতি থাক্‌ করা থাকে, তারই গাঁদির মধ্যে ফেলে দিলাম ওটাকে।

পাঁজার মধ্যে পড়ে ভেঙ্গে মারা যাক্‌ হতভাগা!

"ওঁয়াঁ···া···া···া··· ?"

পড়্‌বা-মাত্রই কাঁদুনি গাইতে সুরু কর্‌ল হারমোনিয়মটা।

তোমার এ কী রকম ব্যাভার হে?—এই কথাই সমুচ্চকণ্ঠে আমাকে বল্‌তে চাইল যেন।

পাজির পাঝাড়া! আমি এক লাথি ঝেড়ে দিলাম তার ওপরে। সেই সপ্রশ্ন কাঁদুনির ওপরেই—তার শেষ প্রশ্নের সূত্রপাতেই। কাঁদুনি আমার দুকর্ণের বিষ। বল্লাম, বেশ চেঁচিয়েই বল্লাম: "চোপ্‌রও! চোপ্‌রও উল্লুক্ কাঁহাকা।"

"ভ্যাঁ···্যা···্যা···্যা···্যা···া···া···ক্— !"

এবার বোধ হয় ও কেঁদেই দিলে ভ্যাঁক্ করে'।

সুরেলা আর্তনাদ শুনে বিনি ছুটে এল ওপর থেকে।

"য়্যাঁ? কী হোলো দাদা? পড়ে গেছলে বুঝি? ফস্‌কে হাত থেকে পড়ে গেল নাকি? আহা-হা! পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল জিনিষটা! হায় হায়!—"

"তাই তো! ভেঙেই্ তো গেল, কী আর হবে!" আমিও দুঃখে যোগদান করি।

"মিস্তিরি ডাকিয়ে সারানো যায় কিনা দেখি।" বিনি বলে।

"নাঃ! ও আর সারে? ও গেছে! একদম্ গেছে। ও আর সারে কখনো? সারবার নয় আর।"

"যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?"

"পাগল হয়েছিস্!" আমি বলে' উঠি: "সারবার ব্যয়ারাম্‌ই নয়। যাকে বলে সন্নিপাত! পোলো আর মলো! যাক্, কী আর হবে? লোকসান্ ছিল বরাতে। এক টাকার লটারীতে পেয়েছিলাম, কিন্তু পোড়া কপালে সইবে কেন? লেখকের কপাল বলেছে কেন তবে?"

বলে' ভাল করে' ওটার হাড়-পাঁজরা ভেদ করে' দেখি : "নাঃ, কিচ্ছু নেই আর ! হয়ে গেছে এর। বারোটা বেজে গেছে। এখন কেবল জ্বালানি কাঠ বানানো ছাড়া উপায় নেই !"

বল্‌তে বল্‌তে মুখখানা ভয়ানক কাচুমাচু করে' ফেলি।

"সত্যিই কি গ্যাছে ?" বিনি সন্দেহ প্রকাশ করে : "আমার মনে হয়, তেমন কিচ্ছু হয় নি হয়ত ! সবই ঠিক্-ঠাক্ আছে ! কেবল একটু—"

বল্‌তে কি, বিনির সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়। আমার নিজেরও সেই রকম আশঙ্কা হচ্ছিল যে কিছুই ওর হয়নি। ওদের প্রাণ কি সহজে যাবার ? 'এসব দৈত্য নহে তেমন !' সাধে কি হেমচন্দ্র বলে গেছেন ? অসুররা কি সহজে মরবার ?

"না না, তুই কি জানিস্ হারমোনিয়মের !" আমি বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলি : "এসব জিনিষ পড়লো কি গেল ! কাঁচের পেয়ালার মতো ঠুন্‌কো একদম্ ! ভারী বিচ্ছিরি !"

এমন সময়ে, ওপরে, টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তেই, বিনিকে চলে যেতে হোলো।

আমি দেখ্‌লাম, আর দেরী নয়, জ্বালানি কাঠে পরিণত কর্‌তে হলে, এই ফাঁকে, বিনি এসে পড়্‌বার আগেই ওকে সেরে ফেল্‌তে হয়।

সিঁড়ির মাথা থেকে বিনি চ্যাঁচায় : "দাদা ! দাদা ! আইভিদি ফোনে ডাক্‌চেন তোমায়।"

আমি ততক্ষণে একটা দা যোগাড় কার' এনে প্রায় কোপাতে যাচ্ছি। তারস্বরেই জবাব দিই : "আইভিদিকে একটুখানি ধর্‌তে বলো। আমি এই এলাম বলে'।"

শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নেই !

কিন্তু, যত সহজ ভেবেছিলাম, হারমোনিয়ম চোপানো মোটেই তত

সোজা নয়, অল্পক্ষণেই টের পাই! অবিশ্যি, যারা অতি শিশুকাল থেকে হারমোনিয়ম চোপাতে অভ্যস্ত হয়েছে তাদের কথা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু আমার মতো একজন আনাড়ীর পক্ষে একটা হারমোনিয়মকে সাবাড় করাই প্রায় কাবার হবার যোগাড়।

পুরো আধ ঘণ্টার গলদ্‌ঘর্ম পরিশ্রমে ওটাকে চেলাকাঠে চালিয়ে আন্‌তে পারি। কটাই বা আর? কতিপয় মাত্র, নাম-মাত্র কয়েক টুকরোয়। একেবারেই আশানুরূপ নয়। পরিশ্রমের অনুপাতে ফল খুব যৎসামান্য, হারমোনিয়মের আকার-প্রকারের দিক্ থেকে তো বটেই। দামের দিক্ দিয়ে খতিয়ে দেখ্‌লেও ক্ষতিই বল্‌তে হয়। চল্লিশ টাকার, এই রকম লম্বা চওড়া, একটা জিনিস ভেঙে এই ক' টুকরো মোটে কাঠ? এমন কী আর লাভ? হারমোনিয়ম্-ওয়ালারা দিনে ডাকাতি লাগিয়েছে, কান মলেই টাকাগুলো নিচ্ছে, বেশ দেখা যাচ্ছে।

যাক্, একেবারে সেরে, ওর গুরুত্বকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে চ্যালায় সমাধা করে', নিঃশক্ত হয়ে, ক্লান্ত-দুর্ব্বলদেহে নড়-বড় কর্‌তে কর্‌তে টেলিফোনের কাছে গিয়ে হাজির হই।

"হ্যালো, আইভিদি, কী হুকুম? বলুন তো!"

"আপনার বরাত ভালো," আইভিদি বলেন: "একটু আগে আমাদের মেয়ে-ইস্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা হোলো। গানের ক্লাসের জন্যে আরেকটা হারমোনিয়মের দরকার আমাদের। লটারীতে পাওয়া ওটা কি আপনি বেচ্‌তে চান্? ভালোই দাম পাবেন, এই ধরুন্ গোটা পঞ্চাশ—? রাজী আছেন বেচ্‌তে? য়্যাঁ? কী বলছেন, শুন্‌তে পাচ্ছিনে? চেষ্টা কর্‌লে আরও কিছু বাড়ানো যায়, ধরে-বেঁধে আরো কিছু ওঠানো যায় সেক্রেটারীকে। ওই ধরুন্, ম্যাক্সিমাম্ গোটা সত্তর—?" ইতি

এক দুর্যোগের রাতে

বিদ্যুৎ চমকানোতে ভারী ভয় খায় মেয়েরা; বিশেষ ক'রে পিসীজাতীয় মেয়েরা। যদি পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতায়, কিংবা ইস্কুলের টেক্স্ট্ বুক্ প'ড়েও এ-কথাটা আমার ঘুণাক্ষরেও জানা থাক্‌ত তা হ'লে গরমের ছুটিতে মুকুন্দপুরে কখনই আমি মর্‌তে যেতাম না। অজ্ পাড়া-গাঁ মুকুন্দপুর—সাধারণতঃ পিসীদেরই সেখানে বসবাস।

বাবা বল্লেন—"যাঃ অনেক দিন ধ'রে লেখালেখি কর্‌ছে তরু। তোকে কবে সেই ছোটবেলায় দেখেছে, দেখ্‌তে চায় একবার। তারিণীও ভারী খুসী হবে। গরমের ছুটিটা সেইখানেই কাটিয়ে আয় না কেন? গান্ধীজীও বলছেন—ব্যাক টু দি ভিলেজ, তার মানে আবার গ্রামে যাও।"

বাবা দারুণ ভক্ত গান্ধীজীর। আমি প্রতিবাদ করতে চাই—"উহুঁ। তা কি ক'রে হয় বাবা? ব্যাক টু দি ভিলেজ মানে হবে গ্রামের দিকে পিঠ ফেরাও। অর্থাৎ কিনা, সহরেই থাক।"

"তাই নাকি?" বাবা মাথা চুল্‌কাতে থাকেন—"তা হ'লে ও-দুইই হয়! গ্রামেও থাক, সহরেও থাক।"

মা ঘাড় নাড়েন—"তা কেন হবে! ব্যাক টু দি ভিলেজ মানে হ'ল তোমার পিঠ দাও গ্রামকে, অর্থাৎ কিনা গ্রামকেই তোমার পীঠস্থান কর। তার মানে, গ্রামেই পিঠ দিয়ে পড়ে থাক চিৎ হয়ে।"

মার বাক্যে বাবার উৎসাহ হয়—"তবে তো গান্ধীজীর ব্যাখ্যাই ঠিক তা হ'লে!" হুঁ আমার বাবা নিদারুণ ভক্ত গান্ধীজীর "গান্ধীর কথা তবে শুনতেই হবে তোকে। তা ছা'ড়া এখন আমের

সময়, পাড়াগাঁয়ে আম প্রচুর। কিনে খেতে হয় না, আম-বাগানে গিয়ে হাত বাড়িয়ে গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই হ'ল; হাতেই এসে পড়্‌বে। মাথাতেও পড়্‌তে পারে। টুপ্‌টাপ্‌ পড়ছেই। সেই যে রবিঠাকুরের কবিতাটা—

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম্—"

হাত ঝেড়ে মাথা নেড়ে বেশ আবৃত্তি সুরু করেছিলেন বাবা। কিন্তু ধুমেই এসে ধুম্ ক'রে তাঁকে থেমে পড়্‌তে হয়। তার পর আর মনে পড়ে না। না-বাবার না-আমার? আর মা—কবিতার ধার দিয়েই মা যান্ না। ও-জিনিস তাঁর দু-কর্ণের বিষ।

যাক্, অবশেষে রাজীই হলাম। গান্ধীজীর কথায় নয় অনেকটা রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসে।

আমের আশায় (আমাশায় নয়!) আমার মুকুন্দপুর আসা। এসেই দেখ্‌লাম পিসীরা খুব ভ্রাতুষ্পুত্রবৎসল হয়, বিশেষ ক'রে পিস্তুত ভাই-বোন যদি না গজিয়ে থাকে। আমার আদর-যত্নের আর অবধি রইলো না। মার কাছেও কখনো এত ভালোবাসা পাই নি! মনে মনেই আমি এর একটা ব্যাকরণ-সঙ্গত সূত্র রচনা ক'রে নিই। মা? মা হচ্ছেন শুধুই মা, সীমার মধ্যে তিনি। কিন্তু পিসীমা? তাঁর পরিসীমা কোথায়?

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বিদ্যুতের সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ত আছে, কিংবা কিছু বৈদ্যুতিক অংশও তাঁদের মধ্যে থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়—তা না হ'লে বিদ্যুৎ-চমক সুরু হলে মেয়েরাও চম্‌কাতে থাকে কেন? আমার মাকেও চম্‌কাতে দেখেছি; বিনিকেও দেখেছি, বিনির বেড়ালকেও। কিন্তু পিসীমার মত কাউকে নয়। একটা নেংটি ইঁদুরের সাম্‌নেও তিনি অকুতোভয়ে অটল থেকে যাবেন,—কিন্তু বিদ্যুৎ চম্‌কালে পিসীমা? তক্ষুণি

খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়েছেন।

সেই দুর্যোগের রাতের কথা চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে। ভাব্‌লে এখনো হৃৎকম্প হয়। ক্যালামিটি কখনো একা আসে না, খাঁটিই এ কথা। সে রাত্রে তারিণী বাবুও বাড়ী নেই (সম্পর্কে তিনিই আমার পিসেমশাই), পাশের গ্রামে গেছেন, জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন, তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাত্রে ফিরবেন কিনা কে জানে!

বাড়ীতে কেবল পিসীমা আর আমি। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুক্‌তে বেশী দেরী হল না। রাত দশটার মধ্যেই সব খতম্‌। দরজা জান্‌লা ছিট্‌কিনি সমস্ত ভালো ক'রে বন্ধ করবার পিসীমার হুকুম হয়ে গেল। আপত্তির সুরে আমি বলি—"দরজায় তো খিল্‌ এঁটেছি, কিন্তু যা গরম পিসীমা! জান্‌লাগুলো বন্ধ কর্‌লে তো মারা যেতে হবে।"

"গরমে লোক মারা যায় না।" পিসীমা বলেন, "চোরের হাতেই মারা যায়, ডাকাতের হাতেই মারা যায়। জান্‌লা খোলা রাখ্‌লে, চোর-ডাকাত লাফিয়ে আসতে পারে। তা জানিস? তার ওপরে উনি আবার বাড়ী নেই—সাম্‌লাবে কে?"

যেন উনি বাড়ী থাক্‌লেই সাম্‌লাতে পারতেন! পিসে হতে পারেন কিন্তু চোর-ডাকাতকে ধ'রে পিসে ফেলবেন এত ক্ষমতা নেই ওঁর। এ আমি খুব জানি! আমার মন্তব্য কিন্তু মনে মনেই আমি উচ্চারণ করি। ততক্ষণে পিসীমা কোনো জানালায় একটা খড়্‌খড়িও ফাঁক রাখেন না।

অন্ধকার ঘরে দারুণ গুমোটের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে কখন একটু তন্দ্রার মত এসেছে, এমন সময়ে—

ক্বড়্‌—ক্বড়্‌—ক্বড়্‌—ক্বড়াৎ—

আচম্‌কা জেগে উঠি। ততক্ষণাৎ ঘরের অন্য কোণ থেকে পিসীমার আর্তনাদ শোনা যায়। "মণ্টু! ও মণ্টু!"

"পিসীমা? কী পিসীমা?"

"চৌকির তলায় সেঁধো। তাড়াতাড়ি সেঁধিয়ে যা। দেরী করিস্‌ নে।"

আমি উঠে বসি। চৌকির তলায় সেঁধুব কেন? চোরটোর লাফিয়ে এল নাকি? কিন্তু দোর-জান্‌লা তো বন্ধ, ঘর তেম্‌নি অন্ধকার—আস্‌বেই বা কি ক'রে? কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে ভাব্‌তে থাকি।

"ঢুকেছিস্‌?"

"উঁহুঁ।"

"ঢুকিস্‌ নি এখনো? সর্বনাশ কর্‌লি তুই। ঢুকে পড়্‌ চট্‌ ক'রে।"

"কেন, কি হয়েছে পিসীমা!"

"এখনো কথা বলে! কি হয়েছে! আকাশে বিদ্যুৎ হান্‌ছে যে! বাজ পড়্‌ল শুনলি না?"—পিসীমা ক্ষেপে ওঠেন, "এখন কি তর্ক করার সময়! বল্‌ছি না ঢুকে পড়্‌তে!"

পিসীমার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। কড়্‌—কড়্‌—কড় কড়াৎ—হুম্‌ হুম্‌। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক খড়্‌খড়ির ফাঁকে ফাঁকে ঝল্‌সে ওঠে।

"মর্‌ল ছেলেটা। আমাকেও বেঘোরে মার্‌ল!" চাপা কান্নারও শব্দ আসৃতে থাকে।

কি করি? হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধোতে হয় চৌকির তলায়। "ঢুকেছি পিসীমা।" করুণ সুরেই বলি।

"ঢুকেছিস! আঃ, বাঁচালি! ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময় কি

বিছানায় থাক্‌তে আছে ? শুয়ে পড়িস্‌ নি তো চৌকির তলায় ?”

“নাঃ। হামাগুড়ি দিয়ে আছি।”

“হামাগুড়ি দিয়ে ? কি সর্বনাশ! বিদ্যুৎ চম্‌কানোর সময়ে কি কেউ হামাগুড়ি দেয় ? হাত পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বোস্‌।”

উদ্যমের সূত্রপাতেই কিন্তু সংঘর্ষ বাধে, “কি ক'রে বস্‌ব ? চৌকি লাগছে যে মাথায় !”

“ভারী বিপদ্‌ কর্‌লে! এই সময়ে আবার চৌকি লাগছে মাথায়!” পিসীমা চেঁচাতে থাকেন। “এই কি মাথায় চৌকি লাগবার সময় ? চৌকি মাথায় করে সোজা হ'য়ে বোস ”

“উহুঁ। মাথায় করা যায় না, বেজায় ভারী যে!” পিসীমাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, “পিসেমশাই আর আমি দু'জনে হ'লে হ'য়ত পারা যেত।”

সত্যি আমার একার পক্ষে অত বড় চৌকি মাথায় করা অসম্ভব—দস্তুর মত অসম্ভব। আর. কেবল মাথায় করা নয়, মাথায় ক'রে ব'সে থাকা।

“কি করছিস্‌ মণ্টু—” পিসীমা হাঁক্‌ ছাড়েন।

“চৌকির তলাতেই আছি। হাত পা গুটিয়েই বসেছি। ঘাড় হেঁট ক'রে।”

“ঘাড় হেঁট্‌ ক'রে ? তবেই মারা গেলি! এই সময়ে সোজা ক'রে রাখার নিয়ম যে! চৌকির তলাতেই থাক্‌তে হবে, কিন্তু মাথা উঁচু ক'রে থাকা চাই। তোকে নিয়ে কি করি বল্‌ তো ? একে এই দুর্যোগ—চৌকি কাঁধে করার জন্যে এখন পিসেমশাইকে আমি পাই কোথায় ?—”

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমকে পিসীমার বাক্য বাধা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ ক্বড়াক্কড়্‌ আওয়াজ এবং পিসীমার আনুষঙ্গিক আর্তনাদ!

"হায় মা কালী! হায় মা দুর্গা! কি বিপদ্ই না ডেকে আন্ছে ছেলেটা! কি করি এখন, হায় মা—"

আমিও মনে মনে বলি, "হায় মা!" দাঁতে ঠোঁট কামড়াই, কি করি এখন! ওদিকে পিসীমার চীৎকার, এদিকে দশমণি চৌকি! মহাপুরুষ ব্যক্তি নই যে অসাধ্য-সাধন কর্তে পারব। অসম্ভব কাজ কেবল ওরাই পারে। আমার কান্না আসে।

আবার বিদ্যুতের ঝল্কানি আর বজ্রপাতের শব্দ।

"দেখ্লি, দেখ্লি তো! তোর ঘাড় হেঁট্ ক'রে থাকার জন্য কি সর্বনাশ হচ্ছে! নিজেও মর্বি—আমাকেও মার্বি তুই—" পুনরায় পিসীমার ফোঁস্ফোঁসনি সুরু হয়। "উঠোনে ঘটিবাটি পড়ে নেই তো? তা হ'লেই অক্কা পেয়েছি! পেতল-কাঁসার বাসনে ভারী বিদ্যুৎ টানে—"

"গিয়ে দেখে আসব পিসিমা?"

এই তটস্থ অবস্থা চৌকিদারি পাহারা থেকে যে কোনও পথে পরিত্রাণের সুযোগ পেতে চাই।

পিসীমা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন—"বাইরে যাবি তুই? এই বিপদের মুখে? কি আক্কেল তোর বল্ দেখি? তোর চেয়ে ঘটিবাটির দামটাই বেশী হ'ল?" একটু থেমেই আবার সেই প্রশ্নাঘাত—"ঘাড় সোজা কর্লি?"

চৌকির তলায় থাকা এবং মাথা উঁচু করে থাকা যখন একাধারে সম্ভব নয়, তখন অগত্যা ওর আওতা পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসি। এসে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি, এবং মাথা উঁচু ক'রে। উঃ ঘাড়টা কি টন্টনই না করেছে! দারুণ গরমে চৌকির তলায় প্রাণ একেবারে গলায়-গলায় এসেছিল।

"ঘাড় উঁচু করেই আছি পিসীমা।" অকপটেই বলি এবার।

"আহা বাঁচিয়েছিস।" পিসিমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, "লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, যাদু ছেলে! যা বলি শোন্। আজকের ভয়ানক রাতটা কেটে যাক্, মা দুর্গা করুন্, কাল সকালেই পিঠে ক'রে খাওয়াব। এ কি কর্‌ছিস আবার?—"

"দেশালাই জ্বালছি, লণ্ঠন ধরাব। যা অন্ধকার—"

"কি সর্বনাশ! এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে?" পিসীমা শশব্যস্ত হ'য়ে ওঠেই—"আলোয় যে রকম বিদ্যুৎ টেনে আনে এমন আর কিছুতে না। নিভিয়ে ফ্যাল্—এক্ষুণি। [ক্কড়—ক্কড়্—ক্কড়াৎ—বম্ বম্] দেখ্‌লি তো, কি কর্‌লি তুই!"

"আমি কি করব? ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে বিদ্যুৎ টেনে আনে কিনা তা তুমিই জান! হয় তো টানে, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না তো?" আমি একটু বিরক্ত হ'য়েই বলি।

"এই কি বক্তৃতা কর্‌বার সময়? তুই কি মরতে চাস্? আমাকেও মারতে চাস্ সেই সঙ্গে?"

আমি চুপ ক'রে থাকি। কি করব?

"সেই সপ্তবজ্র-নিবারণের মন্ত্রটা মনে আছে তোর? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল। বজ্রাঘাত থেকে বাঁচ্‌তে হ'লে—ওঃ কি বিচ্ছিরি রাত! কালকের সকাল দেখ্‌তে পাব কি না মা কালীই জানেন! কই, পড়ছিস না?

"জানিই না তো, পড়্‌ব কি?"

"কি মূখ্যু ছেলেটা! এও জানিস্ না? ইস্কুলে কি ছাই শেখায় তোদের? অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমন্ত-বিভীষণ। কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য সপ্তবজ্রনিবারণ॥ ঘন ঘন আওড়া।"

আওড়াতে থাকি। কি আর করব?

শ্লোকপাঠের মধ্যিখানে আর এক দুর্ঘটনা! পিসীমার পোষা

বেড়ালটা কখন আমার পায়ের তলায় এসে হাজির হয়েছে। বেড়ালে আমার ভারী ভয়। লাফিয়ে উঠি আমি। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচ্‌বার চেষ্টায় বেড়ালের গায়েই পা চাপিয়ে দিই।

"ম্যাও—" মণ্টু-চাপা প'ড়ে বেড়ালটাও ত্রাহি ত্রাহি করে।—"মিউ—মিয়াও!"

ধুত্তোর! অন্ধকারে যে ধারে পা বাড়াই সেখানেই বেড়াল! ও যেন একাই একশ' হয়ে সর্বদা পায়ের সঙ্গে লেগেই আছে। পদে পদে এ রকম বেড়ালের উৎপাতের চেয়ে বজ্রপাতও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

"মণ্টু!" পিসীমার শাসনের কণ্ঠ শুনি, "এই কি আমোদের সময়? আবার বেড়াল-ডাকা হচ্ছে?"

"আমি ডাকিনি পিসীমা"

"তবে কে ডাকতে গেল? তোমার পিসেমশাই? তিনি কি বাড়ী আছেন যে বেড়াল ডাক্‌বেন? এমন মিথ্যেবাদী হয়েছ তুমি? ছি! *লিখে দেব দাদাকে চিঠিতে, যে তোমার ছেলে যতই* বড় হচ্ছে ততই—"

"সত্যি বলছি পিসীমা, আমি ডাকি নি। আমি কেন ডাক্‌ব? বেড়াল—"

আমার কথা শেষ হতে পায় না—"বল্‌ কে বেড়াল ডাক্‌ল তবে? কার এত সখ উথ্‌লে উঠ্‌ল? ভূতে ডাক্‌তে গেল?" পিসীমার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ কঠোর হয়।

"উঁহু। বেড়াল নিজেই।"

"য়্যাঁ?" আবার পিসীমার আর্তনাদ! তিনি যে বেশ বিচলিত হয়েছেন, অন্ধকারের মধ্যেও আমি তা টের পাই। "বেড়াল! তবেই হয়েছে। আর আমাদের রক্ষা নেই! বেড়াল ভয়ানক

বিদ্যুৎ-বাহী! বেড়ালের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ, বইয়েতেই লিখে দিয়েছে। কি সর্বনাশ! হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা অশ্বত্থামা বলি ব্যাস—"

"বাবা নয়, বাবারা।" আমি ওঁকে সংশোধন করে দিই— "বহুবচন বলছ না যে পিসীমা!"

"এই সময়ে আবার ইয়ার্কি?" পিসীমা ধমক্ দেন, "হে হনুমন্ত বাবা, হে বাবা বিভীষণ, ছোঁড়াটাকে বাঁচাও। অবোধ ছেলের অপরাধ নিয়ো না বাবা। [ক্কড়—ক্কড়—ক্কড়াৎ—বম্‌বম্—ববম্‌বম্!— পিসীমা যান ক্ষেপে এখনো বুঝি ধ'রে আছিস্ বেড়ালটাকে? ছুঁড়ে ফেলে দে—ছুঁড়ে ফ্যাল—এই দণ্ডে।"

ছুঁড়ে ফেলা শক্তই হয়, কেননা বেড়ালকে ধারণ ক'রে ছিলাম না তো। কিন্তু পিসীমার আদেশ রাখতেই হবে—যে ক'রেই হোক্। অন্ধকারেই আন্দাজ ক'রে বেড়ালের উদ্দেশে এক শূট ঝাড়ি। শূট্ গিয়ে লাগ্‌বি তো লাগ্ লাগে এক তেপায়া টেবিলে; তাতে ছিল পিসেমশাইয়ের ওষুধপত্রের শিশি বোতল (যত রাজ্যের সৌখীন ব্যারাম সব পিসেমশায়ের একচেটে)—সেই এক ধাক্কাতেই টেবিল চিৎপাত এবং শিশি বোতল সব চুরমার্!

পিসীমা গোঁ গোঁ করতে থাকেন; অজ্ঞান হয়ে গেলেন কি না, এই ঘুট্‌ঘুট্টির মধ্যে তো বোঝবার যো নেই! কিন্তু যখন জানেন ঘরের মধ্যে বজ্রাপাত নয়, নিতান্তই টেবিলপাত—তখন তাঁর গোঙানি থামে, আপনিই সাম্‌লে ওঠেন।

"যাক্, ভগবান্ খুব বাঁচিয়েছেন এবার। ওটাকে ঝেড়ে ফেলেছিস্ তো? বেশ করেছিস্! (অন্য সময় হ'লে তাঁর আদরের মেনির গায়ে কাউকে হাত ঠেকাতেও দেন না, কিন্তু বিদ্যুতের সামনে, বেড়ালের ওপরেও পিসীমার চিত্ত নেই।) তুই এক কাজ কর্ মণ্টু।

ঐ তেপায়াটার ওপড় দাঁড়া। কাঠের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে না। চেয়ার কিংবা টেবিলের ওপরে দাঁড়ানোই এখন সব চেয়ে নিরাপদ্। দাঁড়িয়েছিস্ ?”

“উঁহু—”

[ফ্যাশ্—ক্কড়—ক্কড়াৎ—ক্কড়াক্কড়—ববম্ বম্—বম্ বম্ !]

“কি দস্যি ছেলে বাবা! দাঁড়াস্ নি ? এখনও ? তুই কি আমাকে পাগল কর্‌বি ? হে মা দুর্গা—”

“দাঁড়িয়েছি পিসীমা।”

[বিদ্যুতের ঝলক—দুম্‌দাম্ দমাদ্দম্—ক্কড়্—ক্কড়-ক্কড়াৎ।]

“এমন দুর্যোগের রাত কাট্‌লে হয়! দোহাই মা দুর্গা! তোর পিসেমশাই কাল এসে আমাদের জ্যান্ত দেখ্‌বে কি না কে জানে! পরের ছেলেকে এনে কি বিপদেই পড়্‌লুম। তুই বাজ পড়ে মর্‌লে দাদাকে আমি কৈফিয়ৎ দেব কি ?”

অতি সন্তর্পণে এবং সসঙ্কোচে ক্ষীণকায় তেপায়ার ওপর সসেমিরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নীরবে পিসীমার কাতরোক্তি শুনি। বাড়ীতে বাজ পড়্‌লে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য পিসীমাও অবশিষ্ট থাক্‌বেন কিনা আমার সন্দেহ হয়।

“মণ্টু, ভূমিকম্পের সময় কি করে রে ? শাঁখ, ঘণ্টা বাজায় না ? ওতেই ভূমিকম্প থেমে যায়—নয় কি ? ঝড়-বৃষ্টি কি ভূমিকম্পের চেয়ে কম মারাত্মক ? আয়, আমরা শাঁখ ঘণ্টা বাজাই—তা হ'লে ঝড়-বৃষ্টিও থাম্‌বে। তাক্ থেকে ঘণ্টাটা তুই পেড়ে আন্। অন্ধকারে পার্‌বি তো ?”

অন্ধকারেই আমি ঘাড় নাড়ি।

“আরেকটা ছোট শাঁখ আছে ঐ তাকেই। সেটাও নিয়ে আয়। এক সঙ্গে শাঁখ ঘণ্টা বাজাতে পার্‌বি নি ?”

"পারব বই কি !" আমি ব'লে নিই। এখন আমি 'মরিয়া'। আর 'মরিয়া' হ'লে মানুষ কি না পারে ?

"এনেছিস্ ?—বড্ড দেরী কর্‌ছিস তুই। বাঁচতে আর দিলি না আমাদের !"

ডাকের এবং শাঁখের অন্বেষণে তিনটে চেয়ার ওল্‌টাই, গোটাকতক গেলাস্ ফেলি, জলের কুঁজোটাকে নিপাত করি। অবশেষে ঘণ্টাকে পাই। "এনেছি পিসীমা। কিন্তু শাঁখ পেলাম না, কেবল ঘণ্টা।"

"বেশ, এবার ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। খুব জোরে জোরে পেট্—যেন আকাশের দেবতারা শুন্‌তে পান। আমি শাঁখ বাজাচ্ছি।"

পিসীমা শাঁখ বাজান, আমি ঘণ্টা পিটি। প্রাণপণেই পিটি। কানের সমস্ত পোকা বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা জান্‌লা খুলে যায়, এক ছায়া মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। চোর নাকি ? পিসীমা ভয়ে কাঠ হয়ে যান। আমিও ঘণ্টাবাদ্য থামিয়ে দিই।

"ডাকাত পড়েছে নাকি ? ছায়ামূর্তি বলে, "তোরা কি লাগিয়েছিস্ মণ্টে ? এ সব কি কাণ্ড ?"

"বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছি পিসেমশাই !" করুণ কণ্ঠে আমি বলি।

"বিদ্যুৎ ! আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, বিনা মেঘেই বিদ্যুৎ ? এমন খাসা চাঁদ্‌নী রাত ! আর তোদের কাছে বজ্রাঘাত ? বাইরে চেয়ে দেখ্ দেখি !"

তাই তো ! বাইরে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার ধব্‌ধবে জ্যোৎস্না। আমি ও পিসীমা দু'জনেই দেখি। পিসীমা বলেন, "তা হ'লে এত দুম্‌দাম্, ধুম্‌ধাম্ বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি—এ সব কি

তবে ?"

"ওঃ, ওই আওয়াজ !" পিসেমশায়ের উচ্চহাস্য আরম্ভ হয়—"জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন কিনা ! কল্‌কাতা থেকে যত রাজ্যের বাজির অর্ডার দিয়েছেন ! রাত এগারোটার ট্রেনে সব এসে পৌঁছল—বোম-পট্‌কা, তুব্‌ড়ি, উড়ন-তুব্‌ড়ি, হাউই—আরো কত কি ! এতক্ষণ তো বাজি পোড়ানোই হচ্ছিল—তারই ঝলক্‌ দেখেছ, তারই আওয়াজ শুনেছ তোমরা !"

পিসেমশায়ের হাসি আর থাম্‌তে চায় না ।

তারে চড়ার নানান্ ফ্যাসাদ

তোমাদের কারো ওদিকে ঝোঁক্ আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে আমি—সত্যি কথা বলতে কি—তারে চড়্‌তে একেবারেই ভালবাসি নে। চলাচলের পক্ষে রাস্তা হিসেবে ওকে খুব প্রশস্ত বলা চলে না, তা ছাড়া, (টেলিগ্রাফেরই বল, আর সার্কাসেরই বল,) যে-সব পোস্টের ওপরে সাধারণতঃ তার খাটান হয়, মাটি থেকে, তার বেশ উচ্চতা আছে। এই কারণে প্রতিপদেই বিপদের আশঙ্কা।

কিন্তু এককালে, টেলিগ্রামের মত, তারে যাতায়াত করাই আমার কাজ ছিল। আমি সার্কাস্ ছেড়েছি তা খুব বেশী দিনের কথা নয়। তারের উপর দিয়ে হাঁটা, কায়দা-কস্‌রৎ দেখানোর চেষ্টা করা নানাবিধ তারের খেলা দেখানোই ছিল তখন আমার রোজকার কাজ এবং রোজগারের কাজ—ঐ উপায়েই আমার দিন গুজ্‌রাণ্‌ হ'ত। কিন্তু একদা তার-যোগে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাবার ফলেই দারুণ বিরক্ত হ'য়ে সার্কাস্ আমি ছেড়ে দিয়েছি। সে-কথা ভাবতে গেলে এখনও আমার—, কিন্তু যাক্ সে কথা।

তোমরা হয়তো অনুমান করছ আমি পড়ে গেছলাম? উঁহুঁ, মোটেই তা নয়। পড় পড় হয়েছিলাম, কিন্তু পড়ি নি। কিন্তু না প'ড়ে যা হয়েছিলাম তার চেয়ে পড়ে যাওয়াই ছিল ভাল। আমার সেই অপদস্থ অবস্থায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর দর্শকেরাই একবাক্যে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন একথা অস্বীকার করব না। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সেই খেলাটা আর একবার দেখ্‌তে

চেয়েছিলে। আবার দেখার প্রত্যাশায় পরের দিনের টিকিট্ও হয়ত কিনে থাক্‌বে, কিন্তু সে-খেলা দেখাতে আমি আর রাজী হই নি। তার পর কোন খেলাই আমি আর দেখাই নি, তারে চড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

আঃ, সেই জুতো জোড়ার কথা মনে হলে আজও আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। আমার তার-পথের সহযাত্রী, আমার বিপজ্জনক সহচর সেই জুতো জোড়া—তাদের সহায়তায়, এমন কি তাদেরই প্ররোচনায় সার্কাসে তারের খেলা দেখাবার প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়েছিলাম। কত বার সত্যি-সত্যিই তারা আসন্ন বিপদ্ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বিপদ্ থেকে যে বাঁচায়, প্রয়োজন হ'লে এবং প্রয়োজন না হ'লেও সে-ই যে বেশী বিপন্ন করতে পারে এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছ থেকেই আমার হ'ল।

সার্কাস ছাড়ার পর আমি তাদের মুখদর্শনও করি না। তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছি; কোথায় ফেলেছি মনে নেই, আমারই ঘরের আনাচে-কানাচে, দেরাজ-আল্‌মারীর পেছনে-টেছনে কোথাও। আমার দৃষ্টির সন্মুখসীমার বাইরে।

কেন তারে চড়া ছাড়লাম সে-কথা বল্‌ব না—কিন্তু হ্যাঁ, তারে চড়া ছেড়ে দিয়েছি তার পর। আমার আর ঝোঁক নেই ওদিকে। কিন্তু মানুষ যা চায় না তাই এসে তার ঘাড়ে চড়ে—সেই কথাই আজ তোমাদের বল্‌ব।

আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে সমীরদের বাড়ী—সেই সমীর, ক্রিকেট খেলায় যার জোড়া মেলে না। কিন্তু খেলাধূলার কথা নয় কোন, কথা হচ্ছে এই, আমাদের তেতালার ছাদ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে তাদের বাড়ীর গা ঘেঁষে গেছে একটা জিনিস। আর কিছু নয়, টেলি-ফোনের তার।

সেদিন সকালে উঠে দেখলাম একটা ঘুড়ি কোথেকে সেই তারে এসে আটকেছে। রঙীন্ ঘুড়ি, বেশ চৌকোণা, তারে বেধে দোল খাচ্ছে হাওয়ায়।

ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বাল্যকালকে স্মরণ করছি। বাল্যকাল এবং সার্কাস্-কাল।

দুয়ের যোগাযোগ হ'লে তো কথাই ছিল না। সেই মার্কামারা জুতো জোড়ার সাহায্য নিয়ে তারের ওপর দিয়ে গিয়ে ওটাকে পেড়ে এনে এতক্ষণ ওড়াতেই আরম্ভ ক'রে দিতাম হয়তো !

ইত্যাকার চিন্তা করছি, এমন সময়ে নীচের রাস্তা থেকে বালসুলভ কণ্ঠস্বর এসে ধাক্কা মারে—"মশাই, ও মশাই !"

রাস্তার দিকে তাকাই। এমন কেউ না, আমারই জনৈক বালক-প্রতিবেশী।

রঙচঙে ঘুড়িটা ওরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পড়তে বসেছিল, সেই দুর্যোগের মুহূর্তে ঘুড়িটা চোখে পড়্ল—বই ফেলে এসেছে, কিন্তু মই নিয়ে আসে নি। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, মই না আনার মূর্ত্তিমান্ কারণ হচ্ছি আমি।

"ঘুড়িটা আমায় পেড়ে দিন্ না মশাই।"

"কি ক'রে পাড়্ব? নাগালের বাইরে যে!" হাত বাড়িয়ে ওকে দেখালাম। আমার দোতালার বারান্দা থেকে যতদূর সম্ভব হস্ত বিস্তার করলেও মস্ত ব্যবধান।

"আপনি তারের উপর দিয়ে গিয়ে এনে দিন্।" ছেলেটি আবদার ধরে।

"বাঃ, পড়ে যাব যে! দেখ্ছ তো কত উঁচুতে? ওখান থেকে পড়লে আর কি বাঁচব?" সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা যত দূর সম্ভব ওর দিব্য দৃষ্টির কাছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি—"একদম্ ছাতু একেবারে,

বুঝেছ, আর দেখতে-শুন্‌তে হবে না।"

"বাঃ, আপনি পড়বেন কেন? আপনি আবার পড়েন নাকি?" সে শুনতেই চায় না—"তারে চড়তে পারেন যে আপনি!"

"বটে? তারে চড়তে পারি? বল কি! এমন দুঃসংবাদ কে দিল তোমায়?"

"হুম্, মামার কাছে শুনেছি আমি। মামা বলেন, আপনি সার্কাসে তারে চড়তেন।"

মামার কাছে যে শোনে তাকে থামান সহজ নয়। আমি বলি—তুমি এক কাজ কর; তোমার মামার ঘাড়ে চড়ে দেখ না কেন যদি নাগাল পাও।"

এ পরামর্শ সে অগ্রাহ্য করে, তার মামা নাকি ভারী বেঁটে। অগত্যা তাকে সান্ত্বনা দিই—"ঘুড়ি ওড়াবে, তোমার একটা ঘুড়ি চাই, এই তো? এই পয়সা নাও, ঘুড়ি কেন গে।"

আনিটা পেয়ে ছেলেটা লাফাতে লাফাতে চলে যায়। খানিক বাদে আর একটী ছেলে—তার চেয়ে কিছু ক্ষুদ্রাকার—দেখি সামনের রাস্তায় ঘুড়ির ঠিক অব্যবহিত নীচেই এসে দাঁড়িয়েছে।

"আমাকে ঘুড়িটা দেবেন?"

"স্বচ্ছন্দে। তুমি নিয়ে যেতে পার, আমার বিশেষ আপত্তি নেই।"

"আমি কি ক'রে পাড়্‌ব? আমি কি তারে চড়তে জানি?" ছেলেটি জবাব দেয়।

ও বাবা! এও তারে চড়ার কথা বলে যে! ভয়ে ভয়ে বলি—"তা আমিই কি তারে চড়তে জানি?"

"বাঃ, আপনি জানেন না আবার! চড়ে চড়ে কত তার ক্ষইয়েই ফেললেন! সবাই তো বলে! আপনি আমায় পেড়ে দিন।"

"এক কালে পারতাম বটে।" আমি স্বীকার করতে বাধ্য হই,

"কিন্তু এখন তো আর চড়ার অভ্যেস নেই অনেক দিন—যদি পড়েই যাই?"

"পড়বেন না," ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে বলে, "কিছুতেই পড়বেন না, বলছি আমি। আপনি দেখে নেবেন—হ্যাঁ।"

তার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে বিস্মিত করে। আমি কিন্তু সহজে বিচলিত হই না—"সে কথা কি বলা যায়? প'ড়ে গিয়ে কি পা ভাঙ্‌ব শেষটায়?"

"ভাঙে যদি আমি দায়ী।" ও আমাকে ভরসা দেয়।

পরের দায়িত্বে পদচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা একবার ভাবি। পা-ই যদি ভাঙে, তাই ভেঙে ক্ষান্ত হবে কিনা কে জানে? মাথার ওপর দিয়েও চোট্‌টা যেতে পারে। তেতালা থেকে পড়বার সময় বেতালা হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী—সাধারণ মানুষের তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকার কথা নয়। ছেলেটার শিরোদেশ থেকে ঘুড়ির উড়ন্ত দূরত্ব (অথবা দুরন্ত উড়ত্ব) পর্যন্ত মনে মনে একবার মেপে নিই।

"আপনি অত ভীতু কেন?" সে আমাকে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পায়।

আমি লজ্জিত হই, কিন্তু সাহসী হতে পারি না। "ভয় আমার নেই, তবে কি জান, ক'দিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা—"

ছেলেটি কথা শেষ হতে দেয় না—"তাহলে দাদাকে আপনি যা দিয়েছেন আমাকেও তাই দিন্। ঘুড়ি আমি কিনেই নেব।"

"ও, তাই বল।" জোর ক'রে একটু হাসি, "সে কথা মন্দ না।"

আনিটা হস্তগত হবা মাত্র ছেলেটা অস্তগত হয়।

নাঃ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ্ নয়—এখুনি হয়ত আবার কার ভাগ্‌নে এসে ঘুড়িটার ভাগ নিতে চাইবে। অনেক

ছেলের চোখেই ঘুড়িটা এতক্ষণে পড়েছে নিশ্চয়। এ পাড়ার অনেকেরই বেশ উঁচু নজর আছে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। রাস্তার সীমান্তে একটি বালকের আবির্ভাব হতেই আমি আতঙ্কিত হয়ে স'রে পড়ার চেষ্টা করি। অতদূর থেকেই—আমার মনোভাব টের পেয়েই বোধ হয়—ছেলেটা দৌড়তে সুরু করে দেয়। পেছন ফিরতে না ফিরতে ওর ডাক পৌঁছয়—"মশাই, ও মশাই!"

কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করতে হয় (আমি তো কি ছার, ভগবান্ পর্য্যন্ত ক'রে থাকেন বলে শোনা গেছে)। "কি খবর তোমার? বলে ফেল চট্‌পট্।"

"ও ঘুড়িটা আমায় দিন না।" ছেলেটা হাঁপাতে থাকে।

"ও কি আমার ঘুড়ি যে আমি দেব?" এবার আমি সত্যি সত্যিই চটে গেছি। "কার ঘুড়ি আমি জানিও না।"

"তবে ঘুড়ি কেনার পয়সা দিন্।" ছেলেটা স্পষ্টবক্তা এবং বেশী কথা বলতে ভালবাসে না।

অগত্যা ওকেও একটা আনি ছুঁড়ে দিই। তিন-তিনটা আনি বাজে খরচে মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকে।

টেবিলে গিয়ে বস্‌তে না বস্‌তেই নীচে থেকে হেঁড়ে গলায় আওয়াজ আসে—"অগাষ্টাস্ সার্কাসের বিখ্যাত তারের ক্রীড়াপ্রদর্শক তারেশ্বর বাবু কি বাড়ী আছেন?"

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই—"আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছি। কি দরকার বলুন?" ঘুড়িটার দিকে একবার বঙ্কিম-কটাক্ষে তাকিয়ে নিই, এঁরও যেন ওপরেই নজর—এই রকম একটা আশঙ্কা হ'তে থাকে।

"তা, তারেশ্বর বাবু—" ভদ্রলোক হাত কচলাতে সুরু করেন।

(তারের ঈশ্বর ইতি তারেশ্বর, সার্কাস থেকে এই নাম আমার পাওয়া। যে লোকটা ঘোড়ার খেলা দেখাত তার নাম হয়েছিল

ঘোড়েল্। এ নিতান্ত মন্দ না, নাম-কে-নাম খেতাব-কে-খেতাব্!)

"তারেশ্বর বাবু, একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন।" ভদ্রলোকের হাতের কাজ চলতেই থাকে। "দেখুন, আমার ভাগনেরা আব্দার ধরেছে—"

বাক্যটা আমি সংক্ষিপ্ত ক'রে আনি—"কিন্তু তাদের তো আমি—"

"হ্যাঁ, তারা কিন্‌ছিলও বটে। আমি সেই মনোহারী দোকানে দাঁড়িয়ে। আমিই বারণ করলুম, বল্লুম ঘুড়ি কিনে পয়সা বাজে নষ্ট করছিস্ কেন? আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত তারের ক্রীড়াপ্রদর্শক তারেশ্বর বাবু আছেন—"

আমি তাঁকে বাধা দিই—"তারেশ্বর হ'তে পারি কিন্তু তারকেশ্বর তো নই—সব প্রার্থনা পূর্ণ করা কি সাধ্য আমার?"

তিনি আমার কথায় কানই দেন না, বলে চলেন, "তাঁকে বললেই তিনি একটু কষ্ট করে দু' পা হেঁটে গিয়ে ঘুড়িটা এখুনি তার থেকে খুলে এনে দেবেন। তাঁর কাছে ও তো এক মিনিটের মাম্‌লা, পা বাড়ালেই হ'ল। আমিই ওদের কিন্‌তে বাধা দিলুম। সেই পয়সায় ওদের চকোলেট্ কিনে দিয়েছি।"

প্রমাণ স্বরূপ, তাঁর নিজের শেয়ারের চকোলেট্ আমাকে দেখালেন; দেখিয়েই মুখে পুরে দিলেন। তার পরে প্রসন্নমুখে বল্লেন, "ও পাড়্‌তে আপনার কতক্ষণ আর! এক মিনিটের ব্যাপার। তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদের।"

এর আর কি জবাব দেব আমি? বিকৃতবদনে চেয়ারে এসে বসি। একটু পরেই অনতিপূর্ব্বপরিচিত সেই দুই ভাগ্‌নে, তাদের তিন বোন্, ভদ্রলোকের নিজস্ব সাত ছেলে মেয়ে এবং অপোগণ্ড-কোলে একজন ঝি—এই চোদ্দজন, এক বিরাট শোভা-যাত্রা ক'রে এসে হাজির।

একাদিক্রমে সবাইকে দেখি। এরা সকলেই কি ওই একমাত্র

ঘুড়িটার প্রত্যাশী ? জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম তাই বটে। অনন্যোপায় হয়ে পকেট ঝেড়ে ঝুড়ে খুচরা-খাচরা যা ছিল সব বার করতে হয়। প্রাণ এবং পয়সা এই দুয়ের মধ্যে টানাটানি বাধলে লোকে প্রথমতঃ পয়সাই বার করে, প্রাণ সহজে বার করতে চায় না! পয়সা-বিয়োগ বরং সহা যায়, প্রাণ-বিয়োগের শোক একেবারেই অসহ্য।

"দেখ, ক' দিন থেকেই পায়ে ব্যথা যাচ্ছে তাই, নইলে ঘুড়িটা আমি তোমাদের পেড়ে দিতে পারলেই খুসী হতাম।"

ওদের একটু হেঁটে দেখিয়ে দিই। জন্ম-খঞ্জের চেয়েও আমার অবস্থা যে সম্প্রতি বেশী খারাপ, হাঁটার নমুনা দেখেই তা বুঝতে ওদের দেরী হয় না।

"দেখ্‌ছ তো এম্‌নিতেই হাঁটতে কেমন খ্যাঁচ্‌ লাগছে। তার উপরে তারের ওপর দিয়ে চল্‌তে হ'লেই—বুঝতে পার্‌ছ।"

ওরা সমবেদনা প্রকাশ করে। সবাই বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন।

"তা তোমাদের আমি পয়সাই দিচ্ছি, ঘুড়ি তোমরা কিনে নাও গে, কেমন ?"

দেখলাম কেউই এ প্রস্তাবে গর্‌রাজী নয়। পরের দুঃখ এরা বোঝে। প্রত্যোকের হাতেই চারটে ক'রে পয়সা দিই।

অবশেষে ঝি-ও দেখি হাত বাড়ায়।

"য়্যাঁ ? তুমিও ওড়াও নাকি ঘুড়ি ?" আমি একটু অবাক্ হই, "বটে ? তোমারও ঐ বদ-অভ্যাস আছে ?"

এক গাল হেসে মাথা নেড়েই ঝি তার জবাব দেয়, বাক্যব্যয়-বাহুল্য করে না।

অগত্যা ঝিকেও একটা আনি দিই। এবং ওর কোলের অপোগণ্ডটাকেও দিতে হয়। কি জানি ওরও হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর সখ থাক্‌তে পারে। কিছুই বলা যায় না। ওই বা কেন বাদ যাবে ?

আমারই চোদ্দটি আনির তেরটি আমারই চোখের সামনে অপরের ট্যাকস্থ হয়—আমি অম্লানবদনে সহ্য করি। কেবল শিশুটি তার আনিটা মুখস্থ করতে থাকে।

এর পর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে। পাড়ায় ছেলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব! কিন্তু ঘরে বসেও কি পরিত্রাণ আছে? একটি ছোট মাথা দরজায় ফাঁকে উঁকি মারে।

উঁকি মারে, আবার অন্তর্হিত হয়। ডাক দিই।

অভ্যর্থনা পেয়ে কাছে আসে। খুব সম্ভব, আগের জন্মের আলাপী; কেননা ইহজন্মে একে কোথাও দেখেছি মনে হয় না।

সঙ্কোচে ছেলেটির মুখে কথা সরে না। একটা আনি দিই ওর হাতে—"কিছু বল্‌তে হবে না, এই নাও।"

যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি চলে যায়।

নাঃ, ঘরের মধ্যে থাকাও আর নিরাপদ্ নয়। ধরাচূড়া প'রে বেরিয়ে পড়তে হ'ল।

বেরুবার মুখেই দুর্ঘটনা! একটী বালক তীরবেগে আমার বাড়ীর মধ্যে ঢুকছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ভয়াবহ কলিশন, কিন্তু ফিরে আর তাকাই না, হত অথবা আহত ফলাফল কি হ'ল দেখবার দুঃসাহস হয় না। কেবল একটা আনি পেছনে ছেলেটার উদ্দেশে ছুড়ে দিই, দিয়েই দ্রুত অগ্রসর হই।

গলির মোড়ে আর একটি কিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। হন্ হন্ ক'রে সে চলেছে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ ও করে না। তাকে ধ'রে থামাতে হয়। "কোথায় যাচ্ছ বুঝতে পেরেছি। এই নাও।" আনিটা ওর হাতে গুঁজে দিই।

ছেলেটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়। "অনেক দূর থেকেই আস্‌ছ বলে বোধ হচ্ছে। বাড়ীতে আমাকে না পেলে মনে কষ্ট পাবে,

সেইজন্যই দিলাম।”

তবু যেন সে বুঝে উঠতে পারে না।

“আমার পায়ে ব্যথা কিনা, তারে চড়তে পারব না তো! সেই জন্যই।” আমি ওকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করি।

ছেলেটি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে আমি স’রে পড়ি।

অনেকক্ষণ এধারে ওধারে কাটিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরি। সন্ত্রস্ত হয়ে চল্‌তে হয়, বালকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে, বিশেষ করে পার্থিব যে অংশটায় আমার বসবাস। একটা অপার্থিব ভীতি আমাকে বিচলিত কর্‌তে থাকে, পা টিপে টিপে চলি পাড়া দিয়ে। যে রকম ছেলেপিলের সংক্রামকতা আজকাল!

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছতেই একটা কোলাহল এসে কানে লাগে। আর একটু এগুতেই সমস্ত বিশদ হয়। সাম্‌নের, পাশের, পেছনের অলিগলি এবং আমার বাড়ীর আশপাশ জুড়ে কম-সে-কম প্রায় দেড় হাজার বালক! তারা একবার ঘুড়ির দিকে আর একবার আমার বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। কিসের এত আন্দোলন বুঝতে আর বাকী থাকে না

‘ন যযৌ ন তস্থৌ’—কথাটা বড় বড় পণ্ডিতদের লেখায় বারবার চোখে পড়েছে, তোমরাও হয়তো চাক্ষুষ ক’রে থাক্‌বে, কিন্তু কথাটার যথার্থ মানে সেই মুহূর্ত্তেই যেন প্রথম বুঝতে পারলাম।

তারপর কেবল এই বাক্যগুলি অস্পষ্ট ভাবে আমার কানে এল: “ঐ যে তারেশ্বর বাবু!” “তারেশ্বর বাবু এই দিকে—” “আসুন, আসুন, আমরা আপনার জন্যই—”, “ওঃ কখন্‌ থেকে দাঁড়িয়ে, বাপ্‌স্‌!” “কি হ’ল ওঁর, ভদ্রলোক এগুচ্ছেন না তো!” গেঁটে বাত ধর্‌ল নাকি!” “ওদিক্‌ দিয়ে সরে পড়ছেন যে!” “ও বাবা,

তারেশ্বরবাবুর পেটে-পেটে এত !" "কি সাংঘাতিক মানুষ দেখেছিস !" "আরে পালায় যে !" "তারেশ্বরবাবু পালাচ্ছেন !" "পালাল রে, তারেশ্বর পালাল !" সট্‌কে পড়্‌ল যে—ধর্‌ ধর্‌ তারুকে !"

উপসংহারে এই কথাগুলি শুন্‌লাম :

"আপনি কখনও দৌড়ে পারেন আমাদের সঙ্গে ?" "রানিংএর অভ্যেস থাকা চাই মশাই !" "হ্যাঁ, আমাদের মত প্র্যাকৃটিস্‌ করা চাই রেগুলার, রোজ সকালে উঠেই ছুট্‌তে হবে মাঠে।" ব'লে রানিং-শুই কিনে ফেল্লাম ছ' জোড়া !" "কত গণ্ডা মেডেল্‌ই পেয়েছি প্রাইজ !" আমাদের সঙ্গে ছুটে পারবেন আপনি—ছোঃ !" "আর এই দেহ নিয়ে ?" "দেহ না তো কলেবর !" "তারের উপর দৌড় ঝাঁপে কি হয় বল্‌তে পারি না, তবে ফাঁকা রাস্তায় আপনি আমার সঙ্গে—হুঁ হুঁ, জানেন আমি রানিংএ চ্যাম্পিয়ন্‌ ?" "ছি ছি, ছুটে পালাচ্ছেন, এ আপনার ভারী অন্যায় ?" "আমরা বাঘ না ভাল্লুক ?" "আপনি ভারী কাপুরুষ তারেশ্বরবাবু।"

তার পর যা হ'ল তা আর কহতব্য নয়। সম্মিলিত বাক্যতানের মধ্যেই কার্য্যকলাপ সব ঘট্‌তে লাগ্‌ল। মোহনবাগানের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড গোল দিতে পারলে যা হয় (প্রায়ই দিতে পারে না বা নিজেদের গোলে দিয়ে ফেলে তাই রক্ষে) সেই দুরবস্থাই আমার হ'ল। ছেলেদের কাঁধে কাঁধেই ঘুড়ির নীচে বরাবর এসে পৌঁছলাম। আমার তখন কাঁদবার অবস্থা।

"কি চাও তোমরা বল তো ?" অশ্রুপাত সম্বরণ ক'রে কোন রকমে বাক্যস্ফূর্ত্তি করি।

"ওই ঘুড়িটা আমারা চাই। তারের উপর দিয়ে গিয়ে ওটা আমাদের পেড়ে দিন্‌।"

"পায়ে ব্যথা যে"—আমি অভিযোগ জানাই, "বাঁ-পা-টায় !"

"তা'তে কি হয়েছে? এক পায়ে কি যাওয়া যায় না? এই রকম করে—"একটা ছেলে অন্য পা তুলে একমাত্র পায়ে লাফিয়ে চলার কৌশলটা আমাকে দেখিয়ে দেয়।

তবু আমি বল্‌বার চেষ্টা করি—"তারের উপর কি অমন লাফানো চল্‌বে? কতটুকুই বা জায়গা! অত স্কোপ্‌ কই?"

"খুব খুব!" সকলের সমবেত উৎসাহ আনে—

"ও তার ছিঁড়বে না, ভারী শক্ত। ভয় নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে লাফান্‌ না!"

"তবে তাই হোক্‌।" আমি 'মরিয়া' হয়ে উঠি। "সেই হতভাগা জুতো জোড়াকে পাই কি না, খুঁজে দেখি।"

বাড়ীর মধ্যে ঢুকি। বেরুবার মুখেই বাধা পড়েছিল, তা না মেনে এখন এই দুর্দশা। পৃথিবী থেকেই আজ বেরিয়ে যেতে হবে কিনা কে জানে! আড়াই ডজন ছেলে আমার বডিগার্ড্‌ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে আসে।

সেদিনই একটা দালালী করে এক শ' টাকা পেয়েছিলাম, নোট্‌-খানা বুক পকেটে কড়্‌কড়্‌ করছিল। সেইটাই ভাঙিয়ে আনি-য়ে ফেলব নাকি? আনি-য়ে মানে আনি ক'রে। মনে মনে ভাবি। কিন্তু এই করেই কি নিস্তার আছে? কাঁহাতক্‌, কতদিন এমন পারা যাবে? দুনিয়ার যাবতীয় আনি ফুরিয়ে গেলেও ছেলে ফুরোবে না। জীবাণুর চেয়েও ছেলেরা সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশী। তবে? তার চেয়ে বরং তারেই চেপে পড়া যাক্‌। একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাওয়ার চেয়ে শুধু প্রাণে মারা যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে, ভাঙা এক আলমারির পেছনে জুতো জোড়াকে আবিষ্কার করলাম। কালিঝুলি মেখে ভৌতিক চেহারা নিয়ে পড়ে আছে আমার সার্কাসের সহচরেরা!—আমার এককালের পরম আত্মীয়

দেখে দুঃখিত হলাম। বেচারাদের সারা গায়ে অগুন্তি আল্‌পিন্‌ আর যত রাজ্যের পেরেক্‌। আমার বাক্সের, দেরাজের আর ঘরের চাবি কেন যে কেবলই হারিয়ে যায় এতদিনে তার কারণ প্রত্যক্ষ হ'ল। সেই জুতোর গায়ে সংলগ্ন রয়েছে সব একত্র হয়ে; মিলেমিশে বাস করছে সবাই। সুট্‌কেসের একটা ছোট তালাও সেই সঙ্গে। একটা কর্ক-স্ক্রুও।

আমার আড়াই ডজন বডি-গার্ডের এক-একজনের উপর এক-একটার ভার দিই। দশ জন আল্‌পিন্‌গুলো নিয়ে বাইরে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আসে। চারজনে পেরেকগুলো সংগ্রহ করে। তিন জন মিলে অনেক ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে তালাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাকী তের জন প্রত্যেকে একটা ক'রে চাবি সজোরে ছিনিয়ে বহু কষ্টে মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে রাখে; কর্ক-স্ক্রুটাকেও।

তার পরে আমি সেই মারাত্মক জুতো পদতলগত করি। বিস্তর পয়সা ব্যয় ক'রে তাল তাল চুম্বক লাগিয়ে 'স্পেশ্যাল' ভাবে ওদের তৈরী করানো হয়েছিল, সার্কাসে ব্যবহারের জন্যই, যাতে তারে যাতায়াতের দুর্যোগে আকস্মিক পদস্খলন না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। এবং কৃতজ্ঞতাসূত্রে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করব, ওদের অনুগ্রহে তার থেকে কোন দিন ভূপতিত হতে হয় নি আমাকে। হ্যাঁ, ভূপতিত হ'তে হয় নি, সত্যি।

কান-ফাটানো করতালির মধ্যে তেতালার ছাদে গিয়ে দাঁড়াই। আবার যেন সার্কাসের দিন ফিরে আসে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অগুন্তি কচি কচি উন্নত মুখ। উদ্দীপ্ত এবং উৎসুক। চারিধারে বালকের জনতার মধ্যে উৎসাহের আর অবধি নেই। এতক্ষণ হৃৎকম্প হচ্ছিল, কিন্তু ওদের উচ্ছ্বাস যেন আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয় ক্রমশঃ—একটা বিজাতীয় আনন্দ হতে থাকে।

ভগবান্ মাথার উপরে এবং জুতো পায়ে—তখন আর ভয় কিসের? আকাশও মাথায় ভেঙ্গে পড়বে না। এবং ভূপতনের আশঙ্কাও নেই। অবলীলাক্রমে তারের উপর দিয়ে চল্‌তে সুরু করি। সমস্ত তারটায় দু দু'বার টহল্ দেওয়া হয়ে যায়। একবার মনে হয়, প্রাতর্ভ্রমণের এমন সোজা রাস্তা থাকৃতে এত দিন ব্যবহার করি নি কেন? এত উচ্চতায় আর এমন ফাঁকা জায়গায় অক্সিজেন নিশ্চয় যথেষ্টই, তবে রোজ সকালে উঠে এখানে পায়চারি করলেই তো হয়! নীচ থেকে হাততালির আর বিরাম নেই।

নীচ থেকে আওয়াজ পাইঃ "ঘুড়ি ঘুড়ি! দেরি করছেন কেন? ধ'রে ফেলুন ঘুড়িটাকে।"

হ্যাঁ, ঘুড়ি! প্রাতর্ভ্রমণের ভাবনার মধ্যে ঘুড়ির কথা ভুললে চল্‌বে না। ধর্‌ব তো বটেই।

কিন্তু আমি আছি তারের উপরে আর ঘুড়ি ঝুল্‌ছে তারের নীচে—কি ক'রে ওটাকে বাগাই? উঁকি-ঝুকি মারি, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করি, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা নীচে যতদূর সম্ভব নামিয়ে দিই, দিয়ে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করি—কিন্তু ঘুড়ি থাকে তেমনি, আমার হাত-পা দু'জনেরই নাগালের একেবারে বাইরে।

তাই তো, এ তো ভারী মুস্কিল হ'ল দেখ্‌ছি!

"বসে পড়ুন্ মশাই। কিংবা শুয়েই পড়ুন্ না! তা হ'লেই ঠিক ধর্‌তে পারবেন।"

নীচে থেকে আদেশ-উপদেশের কামাই নেই, কিন্তু করাই কঠিন। ভালো করেই ভেবে দেখি যে তারের উপর শুয়ে পড়া আমার পক্ষে তত সহজ হবে না। না, বালিশের অভাবের জন্য বল্‌ছি না, এক ঘুমের পর বালিশ খুব কম রাত্রেই আমি খুঁজে পাই (আমার মাথার তলার চেয়ে চৌকির তলাই বালিশের বেশী পছন্দ)—সেজন্য না;

কিন্তু শয্যার সূক্ষ্মতাটাও তো বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

নীচ থেকে তাগাদার রেহাই নেই, আর হাত-তালিও ভারী জোর।

অকস্মাৎ আমি যেন ক্ষেপে উঠি—যা থাকে কপালে, জয় মা দুর্গা, ঘুড়িটাকে আমি হাতাবই! তারের উপর হামাগুড়ি দিয়ে বসি। কিন্তু দুঃসাধ্য-সাধনার সূত্রপাত্রেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

তার থেকে আমার পা ফস্কায়। ছেলেদের উত্তেজিত চীৎকারে আকাশ যেন অকস্মাৎ চৌচির হয়ে ফাটে—কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি ক্রমশঃ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে।

তার থেকে আমি পড়ে যাই। কিন্তু পড়ে যাবই বা কোথায়? যে চুম্বক লাগানো জুতো পায়ে তাতে পড়া অত সহজ নয়। এতক্ষণ আমি ছিলাম তারের উপরে, এখন আমার উপরে থাকে তার—আমি ঝুল্‌তে থাকি, ঘুড়ির মতই, ঘুড়ির পাশাপাশি। সেই সার্কাসের দুর্ঘটনাটার মতন—কি বিপদ্ ভাব দেখি!

নীচে মহা হৈ-চৈ! ততক্ষণে ছেলেরা সব ভারী লাফালাফি সুরু ক'রে দিয়েছে। তাদের উৎসাহ দেখে কে! আমার 'ঝোঝুল্যমান' অবস্থা—আমি নিরুপায়। ঘাড় বাঁকিয়ে আড় নয়নে চারধারে তাকাই। সমবেত সকলের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করি—কি আর করব?

এতক্ষণ বাদে সকালের সেই মামা এগিয়ে আসেন—চকোলেট্‌-খাওয়া মামা। "আহা, কি করছ তোমরা! ভদ্রলোককে নামাবার ব্যবস্থা কর। শুধু লাফালে কি হবে?"

মামা, তোমাকে ধন্যবাদ। মনে মনে সকৃতজ্ঞ হই।

অম্‌নি ক'রে কি ঝুলে থাকা যায়? ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে না? ওইভাবে কতক্ষণ ওখানে থাক্‌বেন?"

বলুন তো! বলুন মামা, আপনিই বলুন। এ ভাবে কতক্ষণ থাকা যায় শূন্যমার্গে ?

মামা একটা দড়ি যোগাড় ক'রে আনেন নিজেই। তাতে ফাঁস লাগিয়ে ঘুরিয়ে ছুড়ে দেন্ ওপরে আমার দিকে। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর দড়ির ফাঁস্‌টা আমার গলায় এসে বাধে।

মামা বললেন—"বি রেডি—সব্বাই! এক হ্যাঁচ্‌কায় নাবিয়ে আন্‌ব। তোরা হাত পেতে তৈরী থাক্—পড়লেই লুফে নিবি।"

এইবার সত্যিই আমার হৃৎকম্প সুরু হয়। "অমন কাজও করবেন না মামা।" আমি প্রতিবাদ করার প্রচেষ্টা করি, "তা হ'লে ফাঁসি হয়ে যাবে যে! এখনও তো আপনাদের কাউকে খুন করি নি আমি!"

মামা বলেন—"তা হ'লে? তা হ'লে উপায়? তা হ'লে একটা মই নিয়ে আয়। হরেকেষ্টর বাড়ী আছে তেতালা-সমান মই, চেয়ে আন্ গে'। মই ধরেই নেমে আসতে পারবেন তারেশ্বরবাবু।"

হ্যাঁ, তা হয়ত পারবেন। তারেশ্বরবাবু মনে মনে ঘাড় নাড়েন।

মই আসে।

আমার বরাবর খাটানো হয়।

মইয়ে হস্তক্ষেপ করি আমি।

পা আমার উপরের দিকে, মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও মহত্তর আকর্ষণের কবলে—একান্ত অসহায়! কিন্তু হাত আছে, হাতই পায়ের অভাব পূরণ করবে এখন। লোকে যেমন পা চালিয়ে নামে, আমাকে তেমনি এখন 'ষ্টেপ্ বাই ষ্টেপ্' হাত চালিয়ে নাম্‌তে হবে।

নাম্‌বার উদ্যোগ করছি, আবার ছেলেদের আর্তধ্বনি। "ঘুড়ি ঘুড়ি! ওটাকেও আন্‌বেন ঐ সঙ্গে।"

হ্যাঁ, ওকেও নিয়ে যাওয়া চাই। তা নইলে সেই এক শ' টাকার

নোটখানাই হয়তো ঘুড়ির মত উড়িয়ে দিতে হবে। আর, যার জন্য এত কাণ্ড, এত হাঙ্গামা, তাকেই কি ফেলে যাওয়া চলে ?

ঘুড়িটাকে করতলগত করার জন্য হাত বাড়াই।

কিন্তু এমুনি দুর্ব্বিপাক—

এতক্ষণ ব্যাটা পাশেই ঝুল্‌ছিল। অম্লানবদনে, কোন উচ্চবাচ্য করে নি—কিন্তু এখন এই মুহূর্ত্তেই কোত্থেকে দম্‌কা বাতাস এসে পড়্‌ল আর গেল সেটা নাগালের বাইরে চ'লে।

এখন সে উড়ছে তারের উপরে,—ঠিক যেখানে একটু আগে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই জায়গায়।

আমি আছি শূন্যে, আর আমার শূন্যস্থান সে পূর্ণ করেছে।

প ণ্ডি ত - বি দা য়

পদ্মলোচন পোষ্টাপিস্ থেকে ফিরছে, মানসের সঙ্গে দেখা হোলো পথে।

"তোর হাতে ওসব কি রে?"

পদ্মলোচন বল্লো—"যত রাজ্যের কাগজ! খবর কাগজ যতো না! স্টেট্‌স্‌ম্যান, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট্ এইসব বাবা পড়েন কিনা। হ্যাঁ রে মান্‌কে, পণ্ডিতমশাই আমাদের খাতা দেখেছেন? কত নম্বর পেয়েছিরে আমি?"

মানস গম্ভীরভাবে জবাব দিল—"এগারো বোধ হয়।"

"মোটে! আর তুই?"

"পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে নেবোখন। ভাগ্যিস্ এগারো পাইনি, তাহলে কি মুস্কিল হোতো বল্ তো! একশ'র মধ্যে তো একশ' দশ আর পাওয়া যায় না!"

"আর সব ছেলেরা?"

"তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস্ পাঁচ-সাতও পেয়েছে। তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েণ্টে'—সব 'বিলো জিরো'!"

পদ্মলোচন হাসতে পারলো না।—"তোর আর কি বল্! তুই পণ্ডিতের ছেলে! তোকে তো আর কিছু বলবেন না! মার খেয়ে মারা যাবো আমরা।"

পদ্মলোচন বাড়ি ফিরে যেন ভাবনার অকূল পাথারে পড়লো। সংস্কৃতে মোটে এগারো পেয়েছে! তার ওপর পণ্ডিতমশায়ের আবার

সব চেয়ে বেশি রাগ তারই ওপর—তাঁর কথার চোট্‌পাট্‌ জবাব দেয় বলেই! সেদিন তো বেঞ্চির নড়বোড়ে পায়াটা ভেঙ্গে নিয়েই কয়েক ঘা তাকে কসাবেন, এমনি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছিলেন; পদ্মর সৌভাগ্য যে, বেঞ্চিটা তার পক্ষ নিয়েছিল; তাই রক্ষে—অনেক টানাটানিতেও কিছুতেই প্রত্যঙ্গটা ছাড়তে সে রাজি হয়নি। নিজের পায়া ভারী রেখেছে। অবাধ্য বেঞ্চিটাকে পদচ্যুত করতে না পেরে সে যাত্রা তাদের দুজনকেই তিনি পরিত্রাণ দিয়েছেন; কিন্তু সেদিন তাঁর যা রাগ সে দেখেছে, এর পরে—এই পফেল, ফেলতু, ফেলু-র পরে—আর ইস্কুলে গেলে কি তার নিস্তার আছে!

খবরের কাগজগুলো বাবাকে দেওয়া আর তার হোলো না। নিজের পড়ার টেবিলে ফেলে রেখে নাওয়া খাওয়া ভুলে সে ভাবতে বসলো। ভাবতে ভাবতে সমস্ত যখন তার এলোমেলো হয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ তার মনে হোলো, একটু আলো যেন পাওয়া গেছে, পণ্ডিতমশাইকে জব্দ করবার একটা উপায় যেন সে আবিষ্কার করেছে। সংবাদপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে হাসিমুখে টেবিল থেকে উঠলো।

ইস্কুলে গিয়ে শুনল, সংস্কৃত-পরীক্ষায় তাদের নম্বরের বহর দেখে হেড্‌মাস্টারমশাই এমনই হতভম্ব হয়ে গেছেন যে, তিনি স্বয়ং আজ পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে আসবেন! খবর পেয়ে পদ্মলোচন খুশিই হোলো! সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল—আজ একটা বিহিত সে করবেই তাকে নাম পাল্‌টে ধূম্রলোচন বলে ডাকার, যখন তখন বেধড়ক পিটন দেওয়ার প্রতিশোধ আজ তাকে নিতেই হবে। ক্লাসে ঢুকে নাকে নস্যি গুঁজে চল্লিশ মিনিট তিনি ঘুমিয়ে সুখ করবেন, আর বাকি দশ মিনিট সুখ করবেন পড়া নেওয়ার অছিলায় তাদের পিটিয়ে—এটি আর হচ্ছে না বাবা! পদ্মলোচন আজ মরীয়া।

হেড্পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে হেড্মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকলেন। ছেলেদের জিগ্যেস করলেন—"সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে এমন ফেল করলে কি করে হে?"

ছেলেরা নিরুত্তর। আবার তাঁর প্রশ্ন হোলো—"তোমাদের মধ্যে কি কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না কি?"

পদ্মলোচন জবাব দিল—"পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান না স্যার!"

পণ্ডিতমশাই চোখ পাকিয়ে বল্লেন—"কী? অধ্যাপনা করি না আমি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!"

হেড্মাস্টারমশাই পণ্ডিতকে বাধা দিলেন—"আপনি থামুন। কি বলবার আছে তোমার, বলো।"

"সেদিন আমি পণ্ডিতমশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিগ্যেস করলুম, অবশ্য পড়ার বইয়ের বাহিরে। আন্‌সীন্ প্যাসেজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে। তা পণ্ডিতমশাই তার মানেই বল্লেন না।"

পণ্ডিতমশাই রাগে ফুলতে লাগলেন—"কী? কোন্ শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই? শ্লোকার্থ জানি না আমি?"

দাঁত কিড়মিড় করে পণ্ডিতমশাই যেন ফেটে পড়তে চাইলেন—"নিয়ে আয় তোর কোন শ্লোক, আমি অর্থ করিতে পারি নাই!"

হেড্মাস্টারমশাই আশ্বাস দিলেন—"বলো, ভয় কি! তোমার মনে নেই বুঝি?"

পদ্মলোচন ঘাড় নাড়ল—"হ্যাঁ, স্যার, আছে। এই শ্লোকটা স্যার—"

হবার্তাবা কহিপ্রাশা টজেগেনঃ শকেড়ুয়ে।
আণ্ডীবঃ অগুফ্রয়েণ মানষ্টেটঃ-শিবাঙ্গবঃ॥

শ্লোক শুনে পণ্ডিতমশায়ের চোখ কপালে উঠলো। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন, তাঁর সারা জন্মে এমন অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন কি না। পণ্ডিতকে নিঃশব্দ দেখে হেড্‌মাস্টারমশাই বুঝতে পারলেন, শ্লোকটা তেমন সহজ নয়; তাই তাঁকে উৎসাহ দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করলেন—"একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন; উপনিষদ্‌ কিংবা পাঁজির কোনো শ্লোক বোধ হয়, কি বলেন?"

পণ্ডিতমশাই মাথা চুল্‌কাতে লাগলেন—"কোনো উদ্ভট শ্লোক মনে হচ্ছে। উদ্ভট-গ্রন্থ থেকে এর মর্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ করে দেব, ও যেন মান্‌কের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ি যায়।"

পদ্মলোচন বল্লো—"না স্যার, সাম্‌নে দুর্গাপুজা, আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না স্যার!"

পণ্ডিতমশায়ের প্রহারের ভয়ানক প্রসিদ্ধি ছিল। হেড্‌মাস্টার-মশাই পদ্মলোচনের ভয় দেখে হাসতে লাগলেন—"পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি স্কুলে কাল বলবেন, তা'হলেই হবে। আমারও জানার কৌতূহল হয়েছে তো! একটু ঘেঁটে দেখবেন, পাঁজির কিংবা উপনিষদের হবে—ওই দু'টোই তো যতো রাজ্যের শ্লোকের আড়ত—তাই না?"

পণ্ডিতমশাই গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"বেশ, আমার স্মরণে রইলো।"

বাড়ি ফিরে পণ্ডিতমশাই শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে পড়লেন; উদ্ভট-সংগ্রহটাও পাঁতি পাঁতি করে খুঁজলেন। কোনোদিকেই শ্লোকটার কোনো কিনারা হোলো না। নাকে একটিপ নস্য গুঁজে তিনি দারুণ মাথা ঘামাতে লাগলেন—'হবার্তাবা!' সংস্কৃত বলে বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু অভিধানে তো এ শব্দ নেই। বার্তা মানে তো সংবাদ, কিন্তু 'হ…বা'-এর মাঝখানে পড়ে এতো বোধগম্য হওয়ার বহির্ভূত হয়েছে।

'কহিপ্তাশা !' হিপ্ত ছিল আশা, হোলো হিপ্তাশা ! কিন্তু হিপ্ত মানে কি ! একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত ! 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটারই অর্থ অনুধাবন করা যায়, ততটা কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগনঃ'ই বা কি ! আর ঐ 'শকেডুয়ে'··· !

পণ্ডিমশাই অসুখের অজুহাতে তিনদিন ছুটি নিলেন—কিন্তু তিনদিনের জায়গায় সাতদিন হয়ে গেল, তবু ইস্কুলে তাঁর পদার্পণ নেই ! তখনো তিনি শ্লোকটার সুরাহা করে উঠতে পারেন নি। সেদিনও সকালে উস্তটকল্পতরু নিয়ে নাড়ছেন, এমন কি, অবশেষে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকারও পাতা ওল্‌টাচ্ছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ কানে যেতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"কে রে? কে যাচ্ছিস্‌ ওখান দিয়ে ? টেটো ?"

"উঁহুঁ ।"

"মানুকে বুঝি ? টেটোকে তামাক দিতে বল্‌তো। কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক হয়েছে ।"

মানস বল্লো—"টেটো এখন কোন্‌ পাড়ায় কোথায় টো টো করছে, কে জানে !"

"তবে তুই সাজ্‌। গড়্‌গড়াটা আমায় দিয়ে যা—ধূম্রলোচনকে ডেকে আন্‌ একবার ।"

"সে আস্‌বে না ।"

"বলিস্‌, মাভৈঃ। আমি অভয় দিয়েছি। কোনো ভয় নেই অতঃপর ।"

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগলে কিছু সুবিধা হওয়ার আশা করেছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃই তাঁর কাছে সমস্ত ধোঁয়াটে ঠেকতে লাগল। 'আণ্ডীঞ্চ অণ্ডফ্রয়েণ,—এ যে কি বস্তু, তার রহস্য ভেদ করা দূরে থাক, অনুমান করতেও তিনি অপরাগ।

"এই যে ধূম্রলোচন, এসেছো? বাবা পদ্মলোচন, আর প্রণাম করতে হবে না, বোসো বোসো। তুমি কি এই শ্লোকটার অর্থ জানো? জানো না কি?

"জান্‌লে কি আর জিগ্যেস করি স্যার!"

"তাতো বটে, তাতো বটে। আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণ আছে কথাটা—আণ্ডীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে অর্জুন, সব্যসাচী।"

"কথাটা আণ্ডীব, আমার বেশ মনে আছে স্যার!"

পণ্ডিতমশাই ঘন ঘন তামাক টানতে লাগলেন—"সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে তো? কোথাও ভুল করোনি তো? তাইতো—তবে—তাইতো!"

পদ্মলোচন চলে গেলে পণ্ডিতমশাই এবার বৃহৎ-শব্দার্থসংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। মানস সাহস সঞ্চয় করে বললো—"আমি ওর একটা লাইনের মানে করতে পারি বাবা!"

বাবা অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুল্লেন—"কোন্ লাইনের?

"দ্বিতীয় লাইনের, যদি 'আণ্ডীব'-এর জায়গায় হয় আণ্ডিল, আর 'শিবাঙ্গব'-এর জায়গায় হয় গবাংগব।

পণ্ডিতের আর বিস্ময়ের অবধি রইলো না, তিনি মহামহোপাধ্যায় হয়ে হিম্ সিম্ খেয়ে গেলেন, আর কিনা এই দুগ্ধপোষ্য বালক—মূঢ়তা দেখ! আগে হোলে তিনি মেরেই বসতেন, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা মজ্জমান লোকের মতই, তাই কুটো হোলেও মানসকে তিনি আশ্রয় করলেন!—"কি শুনি?

মানস তথাপি ইতস্ততঃ করতে থাকে—"বল্‌ব?"

"বলতেই তো বলছি।"

"আণ্ডিলঃ! মানে এক আণ্ডিল, কিনা এক গাদা, অণ্ডক্রয়েণ

অর্থাৎ অণ্ড মানে ডিম্ব, ফ্রয়েণ মানে ফ্রাই করে করে অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে মানষ্টেটঃ ··মানষ্টেট······"

"ওইখানেই তো আমারও আট্‌কাচ্ছে রে!"—পণ্ডিতমশাই বিজ্ঞের মত এক টিপ নস্য নাকে গুঁজে দিয়ে বল্লেন—"ওই মানষ্টেই হোলো মারাত্মক।"

"আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি বাবা! মানষ্টেটঃ—বলব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে, অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।"

"বটে!" গম্ভীরভাবে পণ্ডিতমশাই বল্লেন—"সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হোলো তবে?"

"অর্থাৎ কিনা, এক গাদা ডিম ভেজে মানস আর টেট গবাংগবঃ, মানে গব্ গব্ করে গিলছে। বোধ হয় ও দেখেছিল।"

পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তিনি অকস্মাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন—"কী! আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে তোদের এই জঘন্য কীর্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস্? হংসাণ্ড কি কুক্কুটাণ্ড, কে জানে!"

বলেই তিনি মানসের পৃষ্ঠপোষকতার মতলবে তাঁর পাদুকা উত্তোলন করলেন। মানস নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে বললো—"ওই জন্যেই তো আমি বলতে চাইনি। আপনার মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল বলেই তো বল্লাম।"

"মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল! এখন যে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হোলো, তার কি?"

পণ্ডিতমশায়ের আস্ফালন কানে যেতেই পণ্ডিতগৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। তিনি যে ভাবে ও যে-ভাষায় মানসের পক্ষসমর্থন করলেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, অণ্ডফ্রয়েণর ব্যাপারে কেবল

তাঁর সহানুভূতিই নয়, দস্তুরমত সহযোগিতাও রয়েছে। অগত্যা মানসকে মার্জনা করে দিয়ে পণ্ডিতমশাই আবার শ্লোকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হলেন।

ইস্কুল থেকে হেড্‌মাস্টারমশাই লোক পাঠিয়েছিলেন পণ্ডিতমশায়ের খবর নিতে। আটদিন হয়ে গেল, কেন তিনি ইস্কুলে আসছেন না—তাঁর কি হয়েছে ?

পণ্ডিতমশাই উত্তর পাঠালেন—সমস্তই হয়েছে, কেবল বাকি আছে 'শকেডুয়ে'—ওইটা হলেই হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে হেড্‌মাস্টার তো হতভম্ব ! শ্লোকটার কথা তিনি কবে ভুলে গেছেন ; আর তাছাড়া সংস্কৃত তাঁর আদপেই মনে থাকে না—তা উপনিষদেরই কি, আর পাঁজিরই কি ! তিনি ভাবলেন—পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেল না ত ? কাল নিজে গিয়ে দেখতে হবে।

পরদিন পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে দেখলেন, সদর-দরজায় তালা লাগানো, তার উপরে ঝুলছে—To Let। পণ্ডিতের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেছেন, কেউ জানে না ; বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়ে, প্রতিবেশীদের কিছু না বলে রাতারাতিই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

পদ্মলোচন পোষ্টপিস্ থেকে ফির্‌ছে, যত রাজ্যের খবরের কাগজ তার হাতে। সরিতের সঙ্গে দেখা হোলো পথে। সরিৎ বল্লো—"আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েছিলি ভাই ! পণ্ডিত বেচারা পালিয়ে বাঁচ্‌ল।"

পদ্মলোচন শুধু হাসে।

"দারুণ শ্লোক বাবা ! পণ্ডিতমশায় একেবারে 'টজেগেনঃ' ! লাভের আশা ত্যাগ করে উধাও হয়েছেন !"

পদ্মলোচন তবু হাসে।

"অবিশ্যি মান্‌কে একটা মানে করেছিল বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করে ওটা বেঁধেছিস্ !"

পদ্মলোচনের হাসি থামে না—"মান্‌কের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে ?"

উৎসুক হয়ে সরিৎ জিজ্ঞাসা করে—'তাহলে আসল মানেটা কি ভাই ? বল্‌বিনে আমাদের ?"

"মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে !"

"ও তো সব খবরের কাগজ।"

"'আরে, এই নামগুলোই তো ওলোট্‌-পালট্‌ করে দিয়েছি ! উল্টো দিক্ থেকে থেকে একটু এদিক্-ওদিক্ করে পড়লেই টের পাবি। ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ, বঙ্গবাসী, ষ্টেট্‌স্‌-ম্যান্ আর ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া।"